এতটুকু আশা

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

জগদীশ চক্রবর্তীকে—

‘অন্ধকার হবে ভয়ে,

ছুটেছি সূর্যের পিছে সন্ধ্যার সময়ে

ছিনে নিতে আরও কিছু আলো

তবু রাত সহজে ঘনালো।

আর কিছু নেই।

জানি, মৃত্যু আসবেই।

তবে এসো, আমি তৈরী আছি

দু’হাত উদ্যত রেখে মাটির বুকের কাছাকাছি

॥ এক ॥

হাজরা-গরচা-র মোড় বাঁ হাতি রেখে সুধীরবাবুর জুয়েল মোটর সার্ভিস। রাস্তার বাতি নিভে গেলে-ও লম্বা-সাইন বোর্ডটা-য় নামের অক্ষরগুলো লাল কালো রঙে জ্বল জ্বল করে। দিনরাতে কাজ বন্ধ নেই এই মোটর সার্ভিসে। কারিগররা বলে, বিশ্বকর্মার কামারশালা। দুই ক্লীনার মাণিক আর জ্ঞান বলে—হাঁ বলাইদা, সুধীরবাবু আমাদের বিশ্বকর্মার ব্যাটা বাইশকর্মা তাই না? রাতে দিনে কামাই নেই!

সত্যিই তাই। হপ্তায় নিয়মমাফিক একদিন কারখানা বন্ধ রাখে সুধীর। আর একদিন হাফ্-ডে শুধু নামেই। কারখানার সামনের দোরে মস্ত তালা। লোহার শেকল পেঁচিয়ে তার মুখে গড্‌রেজের ভারী তালা। পেছন দিকের ছোট দরজাটি কিন্তু খোলা। আর সেদিক দিয়ে ঠিকই কাজ হচ্ছে। গায়ের কাছে পুলিশ ফাঁড়ি, এমন ভরসা সুধীরের কোথা থেকে আসে? সে সব কথা কিন্তু কোনদিনও শুধোয় না সুধীরের কারখানার মানুষ। সব কথার জবাব হয়না। সুধীরের পেয়ারের শালা সুবল-কে কোনদিন বলাই চেপে ধরে। হঠাৎ শুধিয়ে বসে—কেমন ক'রে ডান বাঁ দুই হাতে তাল দিচ্ছে রে সুধীরদা? পুলিশ যদি খবর পায়? না কি ও. সি. কে মোটা খাইয়ে এয়েছে সুধীরদা?

—জানিনা বাবু।

বলাই শুধোলে এমনি ধারা গালভারী জবাব দেয় সুবল। আর অন্য কেউ কথা কইলে দাঁত বের করে খিঁচিয়ে ওঠে।

—কেন পয়সা পাচ্ছ না?

সুবলের দাপট সুধীরের চেয়ে অনেক বেশী। বলাই বলে—সাপের চে' বিছের ঝাল বেশী। সুবল জানে সে তার নিঃসন্তান দিদি বিজলী রাণী মণ্ডলের একমাত্র ওয়ারিশান্। আরো জানে, সে কেন, কারখানার সকল মানুষ জানে, যে সুধীর মণ্ডল এই দোজপক্ষের বৌ-য়ের হাতে কলের পুতুল। যে সুধীর তার কারখানার মানুষদের হর্তাকর্তা বিধেতা, সে বিজলীর সামনে একটা কথা কইতে পারে না। কারখানার কাজ চলেছে—হঠাৎ বিজলীর ফোন এলো—গাড়ী পাঠাও একখানা, শ্যামপুকুর যাব।—নয়তো মাসী এয়েছে। বিধবা মানুষ। দই সন্দেশ পাঠিয়ে দাওগে' একটা ছোকরাকে দিয়ে। অথবা—পাড়ার মেয়ে-ছেলেদের সঙ্গে যাচ্ছি পূর্ণ থেটারে। কারখানার বাদে গাড়ী পাঠিয়ে দিও। ঘরে যাব।

এমনিধারা হাজার বায়নাক্কা। সবাই অবাক মানে।

এত সহ্য সুধীর কেমন করে করে? আবার একদিন দেখা যায় বোকার মতো মুখ করে সুধীর নিজেই এলো টিফিন টাইমের পর। সেদিন কারখানার ছোকরা-রা নির্ঘাৎ জানতে পারে যে সুধীরের ডাগা পরা বৌ আজ ভাতের ওপর রাগ করেছিল। সেধে পায়ে ধরে-ই হোক, বা একজোড়া কানপাশা কবুল করে-ই হোক, বৌকে ভাত খাইয়ে তবে এসেছে সুধীর। বনেট খুলে গাড়ীর ভিতর মুখ ডুবিয়ে দেখতে দেখতে গান ধরে বলাই—

দোজ পক্ষের ময়না
না সাধ্‌লে ছোলা খায়না॥

আবার একদিন বৌ-য়ের বজ্জাতি আরো বাড়ে। মাসী আর মাসীর ছ-টা ছেলেমেয়েকে এনে ঘর বোঝাই করে রাখে দিন রাত। সুধীর

ঘুমুতে আসে কারখানায়। সে সব দিনে বলাইএর-ই কষ্ট হয় সুধীরকে দেখে। বলে—হ্যাঁ সুধীরদা? মোটে শান্তিতে ঘুম হয়নি? দাঁড়াও চা নে' আসি।

চা এনে দেয় সুধীরকে বলাই। বলে—কি ঝুটমুট মেয়েছেলের ঝামেলাতে পড়ে আছ? চল, চলে যাই একদিন বেলুড়।

—বকাসনি বলাই! তোর এই সাত সক্কালে ক্ষ্যাপামি উঠল।

বলাই-এর দিকে চাইলেই সুধীরের অনেক পুরোন সব কথা মনে পড়ে, আর এই লোকটার সঙ্গে তার সম্পর্ক যে কতদিনের সে কথা-ও ঝট্ করে মনে পড়ে। সে সব প্রসঙ্গ পরিহার করতে চায় সুধীরের মন। তাই চলে যায় নিজ কাজে। মঙ্গল মিস্তিরি বলে—

—কি রে বলাই, মালিক পুঁছলে না?

—পুরোন দোস্তি না তোদের?

বলে আর কেউ। বলাই এখন কিন্তু চটে যায় না আগেকার মতো। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হাতের বিড়ি হাতেই নিভে যায়। বলে

—চিরকাল অমনি ছিল না মানুষটা। তোরা বুঝবি না।

যে সুধীর সদাসর্বদা কেমন করে পয়সা মারবে মিস্তিরি-র সেই ফিকিরে ফিরছে—তার সম্পর্কে অমন নরমসুরে ভাবতে-ও প্রস্তুত নয় মঙ্গল মিস্তিরি। গ্রীজ মাখা হাতে কানের পেছন থেকে বিড়ি টেনে এনে ধরায় সে। কিন্তু তখনও বলাই একটু আনমনা হয়ে থাকে। পনেরো বছর আগে সে আর সুধীর যেত বেলুড়ে। সুধীরের শ্বশুর বাড়ীর বাগানে। মাছ ধরতো পুকুরে আর খেয়েদেয়ে দিন কাটিয়ে ফিরে আসতো। তখন-ও সুধীর এমনধারা সুধীরবাবু হয়নি। আর ঘরে তার এই বিজলী নয়, বৌ ছিল শান্তিলতা। ফর্সা, পানসে রঙের শান্ত মেয়ে। সেই বৌ-টা মরে গেল আর সেই সঙ্গে-ই যেন কেমন ধারা হয়ে গেল সব। শান্তিলতা বলাইকে আদর যত্ন করতো।

সুধীর আর বলাই দু' একদিন নেশাভাঙ করলে-ও কিছু কইতো না। বলতো—বাড়াবাড়ি ক'রোনি বাবু। মাতাল দেখলে বড্ড ডরাই আমি, হ্যাঁ!

বিজলী তেমন নয়। বলাইকে মিস্তিরি বলে ডাকে। স্বামীকে লুকিয়ে পয়সা কড়ি নিয়ে কথা শোনায়। বলে—তুমি বাবু লোসকান করো কারখানার। সুবলের কাছে সাক্ষাৎ জেনিছি, হ্যাঁ!

যে সব বিষয়ে কিছু জানা নেই বিজলীর সে সব কথা-ও আগ বাড়িয়ে বলতে যায়। আগেকার সম্পর্ক নেই। তা হ'লে বলাই বলতো—বৌদিদিকে আলতু ফালতু বকতে বারণ ক'রো দিখিনি সুধীরদা? মেয়েছেলে সকল বিষয়ে অত বকে কেন?

কিছু না বলে চলে আসে বলাই। সত্যিই সম্পর্ক আর তেমন নেই। বলাই তেমনিই পড়ে আছে। কিন্তু সুধীরদা? সে কত বড় হয়ে গিয়েছে। বলাই তার কূল পাবেনা কোন কালে-ও।

একদিনের কারিগর সুধীর মণ্ডল এখন হয়েছে বাবু। সুধীরবাবু। তার কারখানার ইয়ার্ডে এখন অমন দশখানা লরি, ট্রাক, প্রাইভেট আর ট্যাক্সি সারাই হচ্ছে। কোলাপ্‌সিবল দেয়ালে আষ্টেপিষ্টে শেকলের প্যাঁচ মারা গ্যারেজে-ও সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভাগ। বাছ-বিচার সেখানে-ও পরিষ্কার নজরে পড়ে। গাড়ির কাপ্তেন নূতন মডেল ষ্টুডিবেকার আর ফোর্ড যেন ঈষৎ নাকতোলা ভাবে আলগোছ হয়ে রইতে চাইছে গেরস্তঘরের ছা-পোষা ভক্সহল, অস্টিন ও হিন্দুস্থান থেকে। কিংস্‌ওয়ে ডজ-এর যেমন ভারী চেহারা তেমনিই জায়গা লাগে। তবু তার মধ্যে একটা বনেদীয়ানা রয়েছে। মাঝখানে হাপগেরস্ত সেকেণ্ডহাণ্ডগুলো নেহাৎই দেখা যায় সসঙ্কোচ। বিয়েবাড়ীর মেয়ে লাইনে এপাশে জড়োয়া, ওপাশে জড়োয়া, মাঝখানে ব্রোঞ্জের চুড়ি আর নোয়া পরা এক যতীনের বৌ ছেলে কোলে কোরে যেমন সঙ্কুচিত হয়ে বসে থাকে।

ইয়ার্ডখানা সত্যিই বিশ্বকর্মার এক কামারশালা! রাতেদিনে আঁধার শেডঘরে গ্যাসবাতি জ্বলছে। ইলেক্‌ট্রিক তারে স্পার্ক দিচ্ছে—চলেছে ওয়েল্‌ডিং। স্প্রে রং ওঠাচ্ছে। কয়জোড়া পাকা কারিগরের হাত হাতুড়ি পিটে বেয়াড়া বনেটকে সাইজে আনছে ঠং ঠং করে। দিবারাত্রির শব্দ চলেছে নানারকম। তেলকালি মাখা গেনজী প্যান্টে কারিগররা ফিরছে যেন ভূত। সন্ধ্যে নাগাদ কারিগররা জানে মরে যায়। আবার ওভারটাইমের কথা শুনলে সেইসব মরা প্রাণ-ই নড়ে চড়ে জ্যান্ত হয়ে ওঠে। বিরিঞ্চির দোকানে গ্রীজের গন্ধ মাখা চা-রুটি খেয়ে নিয়ে আবার লেগে যায় কাজে। ওভারটাইমে কারিগরদের দেখাশোনা খবরদারীর ভার সুবলের ওপর ছেড়ে দিয়ে সুধীর মণ্ডল চলে যায় বাড়ী। আর ভগ্নীপতি চোখের আড় হতে না হতে সুবলের চেহারা যায় পালটে। তারের মুখে চড়া বাতি লাগিয়ে কারিগররা কাজ করে। সেই আলোতে বসে সুবল সিনেমার কাগজ পড়ে—বিড়ি ফোঁকে—নয়তো পাড়ার হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের মেয়েকে প্রেমপত্র লেখবার ভাষা খোঁজে। প্রথমেই-ই দীর্ঘ ঈ টেনে লেখে—প্রীয়া আমার...তারপর ভাবতে সুরু করে কেমন করে চিঠিটা সূতোয় গুলি পাকিয়ে নমিতার জানলা দিয়ে ঘরে ছুড়ে মারবে মাঝরাতে ঘরে ফেরবার সময়ে। ভাবতে ভাবতে এমন ফুর্তি লাগে সুবলের যে হঠাৎ 'তুমি যে আমার' ভাঁজতে সুরু করে।

ব্যারিস্টার সান্ন্যালের কালোডজ খানা এবার-ও রাঁচির রাস্তা থেকে আদুরে ছেলে ভেঙে এনেছে। এবার নিয়ে তিনবার হলো। গাড়ীগুলো বলাই-এর প্রাণ। বলাই বনেট খুলে তদারক করে ডজখানার ক্ষয়ক্ষতি নিবিষ্ট মনে। দেখে আর জিভে তালুচি চুকচুক শব্দ করে। বলে—কথা কয়না বলে কি জানা নেই রে বাবা! এ করেছে কি!

জ্ঞান হোসপাইপে জল টেনে এনে কাদা ধোয়। বলে—তুমিও যেমন মানুষ বলাইদা! ও ছেলে-র এখন একখানা আলাদা গাড়ীর

সাধ! নতুন মডেলের একখানা অষ্টিন পেলে পাশে কাকে নে' উড়বে' জান? সেই নাক বোঁচা মেয়ে গো! সিনেমায় নামাবে তাকে, আর ও হবে ডিরেকটার।

শুনতে শুনতে-ই বলাইয়ের কান থেকে সে সব কথা চলে যায়। শুধু রিপেয়ারের তরিকা-টা মগজে লাটপাট খায়। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে

—সুবল! মুখে আগুন দে' বাবা!

সুবলের স্নো পাউডার মাখা কপাল বিরক্তিতে কুঁচকে যায়। তবু বলাইকে কিছু কইতে সাহস পায় না। চট্‌পট্‌ চারমিনারের প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে ধরে।

বলাইকে কেউ চটাতে পারে না। এই মোটর ওয়ার্ক্‌সের জুয়েল হচ্ছে বলাই। অন্য লোকের কথা কি। খোদ সুধীরবাবুর কাছেই সে সিগারেট চায় যখন তখন। বড় বড় মোটর গাড়ীর মালিক এসেছে ইয়ার্ডে। মক্কেলের সঙ্গে কথা কইছে সুধীর। সেখানেই গিয়ে দাঁড়াবে বলাই। বলবে—সুধীরদা সিগ্রেট দাও!

এমনি ডাঁট। আর সুধীর ও তেমনি। বলাইয়ের বেলা তার ঘুড়িতে লম্বা সূতো ছাড়া থাকে। বলাই সে সূতোর সুবিধে নিয়ে ইচ্ছাধীন মতো খেলে বেড়ায়। ফর্সা মুখে বসন্তের দাগ। ঠাণ্ডা চাউনি ছোট ছোট পলকহীন চোখে। চট করে সিগ্রেট এগিয়ে ধরে সুধীর। মক্কেলদের কাছেও বলাইয়ের দারুণ খাতির। এই বলাই আছে বলে তারা এ কারখানায় গাড়ী দেয় সারতে। মক্কেলরাও তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করে। বলাইও 'ইয়েস্ সার্' বলে হেসে হেসে জবাব দেয়।

আবার কোনদিন বা বিগড়ে থাকে বলাই। ভাল কথা শুধোলেও ক্ষেপে ওঠে। বলে

—মেলা ক্যাচর ক্যাচর করিসনি তো মানিক! হ্যাঁ:—খেজুরে আলাপ করতে এসেছিল সুবল। বলে—বলাইদা, গোলড্‌ফেলেক খাবে?

দিলুম ভাগিয়ে। সিগ্রেট দেখাচ্ছে! দোজপক্ষের ভগ্নিপোত্ পেয়েছ ফুঁকে দিচ্ছ। যাঃ যাঃ—বলাইদাস পরের পয়সায় অমন গোলড্‌ফ্লেক খায় না!

সাধে কি সুবল চটে ঐ বেয়াড়া বেখাপ্পা মেজাজের মানুষটার ওপর? বলাইকে কিছু বলতে সাহস পায়না। বাড়ী গিয়ে তার দিদির কাছে মনের কথা বলে। কুণ্ডু লেনের দোতলা বাড়িতে সুবলের দিদি বিজলা ওপরহাতে তাগা পরে টিয়াপাখীকে ছোলা খাওয়ায়। সুবলের নালিশ শুনে সে সুধীরমণ্ডলকে বলে—কেন গো, বলাই মিস্ত্রীকে তুমি ধমকে দিতে পার না? কথায় কথায় সুবলকে কথা শোনাবে কেন ও? ও না মিস্তিরি?

সুধীর কথা কয় না। চুপ করে থাকে। বৌয়ের কথায় যে মানুষ ওঠে বসে এক্ষেত্রে তার মুখে কথা জোগায় না। ছোকরা ছোকরা চেহারা বলাইয়ের। দেখলে কে বলবে বয়স তার পঁয়ত্রিশ —ঘরে একটা ছেলেমানুষ বৌ আর দুটো বাচ্ছা আছে! বলাইকে সুধীর এমন ঘনিষ্ঠভাবে জানে, যে ঐ মুখখানাকে অনেকদিন ধরে তার মনে পড়ে। সেই ছোট বেলার কচি কচি মুখ। তারপর বড় হয়ে প্রথম দাড়িগোঁফ গজানো চেহারা—আবার বিয়ে করা বোকাবোকা চেহারা বলাইদাস। সুধীর বিজলীর কথা শুনে কোন কালে কিছু বলতে পারবে না বলাইকে। আর কেন যে পারবে না, সম্পর্কটা যে শুধু ইয়ার্ডের মালিক আর মিস্তিরির-ই নয় সে কথা-ও বলতে পারবে না। বললে-ও বুঝবেনা বিজলী। আর কেন যেন, বিজলীকে বোঝাবার খুব একটা ইচ্ছে ও নেই সুধীরের।

॥ দুই ॥

সম্পর্ক অনেক কালের। কুণ্ডুলেনে সুধীর মণ্ডলের বাপের বাড়ী আর ইলেক্‌ট্রিক জিনিষের কারবার। বলাইয়ের বাপ নিতাইচাঁদের ছিল মুদীর দোকান। তেমন জৌলুষের নয়। ছোট খাটো। পয়সা পয়সা চা-পাতার প্যাকেট মালা গাঁথা ঝুলতো সুমুখে। ঘষাকাঁচের বয়ামে থাকতো মুড়ি লজেন্স। আর বেড়ার গায়ে ফুটো ঢাকা থাকতো 'বিদ্যাপতি চিত্রে মিস কাননবালার' ছবিতে। সুধীরের সঙ্গে বলাইয়ের প্রথম পরিচয় পার্কে। খেলাধূলার ভেতর দিয়ে। বলাইয়ের চোখে সুধীর হয়ে উঠলো পরম শ্রদ্ধাভক্তির মানুষ সুধীরদাদা! সুধীরের হাতে বিড়ি খাওয়ার হাতে খড়ি হলো বলাইয়ের। তারপর সিনেমা দেখা, লেকের পাশে গিয়ে রাত অবধি বসে থাকা। উঠতি বয়সে পাড়ার ছোকরাদের সঙ্গে ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের মেয়েদের প্রেমের গতিবিধি লক্ষ করা—সবই হয়েছে একসঙ্গে।

সুধীরের ছিলো গান গাইবার সখ। বেশ গলা ছেড়ে ভক্তির গান গাইতো সে। দুজনে কতদিন চলে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। নদীর পাড়ে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে সুধীর গান করেছে গলা ছেড়ে। আর বলাই মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে শুনেছে। বলেছে—সুধীরদা, ফাস্‌ক্লাস গলা না তোমার? চল না, গ্রামোফোন কোম্পানীতে গে' রেকর্ড করে আসবে?

সুধীর বলাই নয়, সে নিজে জেনেছে যে না, বলাই ছাড়া তার গান আর কোন কানে এমন সুমধুর লাগা সম্ভব নয়। তবু সে সাময়িক

ভাবে বেশ আনন্দ আর আত্মপ্রসাদ পেয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গলা কাঁপিয়ে অত্যন্ত উঁচু স্কেলে গান ধরেছে

—তোমার-ই পূজার ফুল নিতুই সাজায়ে রাখি ॥

অথবা

—নাই বা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনো বাকি ॥

সুধীর যখন বুড়ো কিরপাল সিং-য়ের গ্যারেজে কাজ শিখতে গেল, দুদিন বাদে বলাই-ও ইস্কুল ছেড়ে তার সঙ্গ ধরলো। যে কাজ সুধীরের বুঝতে অনেক দেরী লাগে, সে কাজ বলাই এক নিমিষে শেখে। এমন চমৎকার মেরামতের কাজ রপ্ত করলো বলাই, যে কিরপাল সিং বলতো—

—তুমি বাবা সাহান সা লোক! পিঠে চাকু মেরে কাজটি শিখে নিলে। ছোটবেলা কি খেয়ে বড় হয়েছিলে? দুধ, না পেট্রল? নির্ঘাৎ পেট্রলে মুখ দিয়ে বড় হয়েছিলে!

বলাই-য়ের বাপ নিতাইচাঁদ প্রথমটা ছেলেকে নিত্যি মার ধোর করতো। তারপর যখন ছেলে আজ দুটো, কাল চারটে—এমনি করে মাস গেলে বিশপঁচিশটা টাকা আনতে সুরু করলো, তখন আর কিছু বললো না। একদিন বলাইকে বললো—

—জজবাড়ীর অমর বাবু বলছিল মোটর মেরামতির ইস্কুলে ছ-টা মাস ট্রেনিং নিলে পরে বড় সায়েবী দোকানেও কাজ পাবি। যাবি না কি? দেখবো চেষ্টা করে?

গায়েই মাখলো না বলাই। বললো—মিছে ঝুট ঝামেলায় যেতে পারবো না বাবু। সুধীরদা' কারখানা দেবে। আমাকে পাটনার করবে বলছে। আমি নয় যাবো সেখানে।

কিন্তু নিজের মোটর রিপেয়ারিং সপ তখনো সুধীরের কাছে এক স্বপ্ন জগতের ব্যাপার। বলাই আর সুধীর একই সঙ্গে গেল ধর্ম্মতলায়। ম্যাডান সাহেবের রিপেয়ারিং সপে চাকরি নিল।

সেই সময়ই বিয়ে হলো সুধীরের। বৌ-য়ের নাম শান্তিলতা। বেলুড়ে বাপের বাড়ী। সব কথা হয়ে গেলে পরে একদিন সুধীর বলাইকে নিয়ে গেল সাঙ্গুভ্যালী। বললো

—বলাই, আমি তো দেখলুম না একদিন-ও। যাবি আমার সঙ্গে ?

—কেমন করে ? হ্যাঁ সুধীর দা, ইস্কুলে পড়ে ?

—না। কেন ?

—তবে যেতে আসতে পড়তুম গে' সাইকেল নে' সামনে !

—না। তবে নিত্যি শুনিছি যায় শিবতলায়। বোশেখ মাস তো !

তাই হলো। সাইকেল নিয়ে আশেপাশে চক্কর মেরে এলো বলাই। চায়ের দোকানে অপেক্ষা নিরত সুধীরকে বললো

—ফাস্‌ক্লাস বৌদি হচ্ছে সুধীরদা ! তোমার ভাগ্যি আছে।

শান্তিলতা আর কিছু না হোক সত্যিই শান্তি দিতে জানতো। কানায় কানায় ভরা পুকুরের মতো টলটলে বাংলা দেশের মেয়ে। স্বভাবটি গোল গাল। কোন-ও খোঁচা নেই বেরিয়ে। সুধীরকে ভালবাসতো। সেবা যত্ন করতো। সেই বৌ থাকতেই সুধীরের কারখানার পত্তন হলো। একবার চাইতে কোন কথা না কয়ে-ই শান্তিলতা সুধীরকে গয়নার বাক্স এনে দিয়েছিলো। আবার কারখানার অবস্থা ফিরলে পরে সেই সব গয়না এক এক করে এনে দিয়েছিলো সুধীর। কানের ফুল, গলার হার আর হাতের রুলি। অনন্ত জোড়া এবার আসবে খালাস হয়ে। কিন্তু ছেলে হতে গিয়ে মরে গেল শান্তিলতা। বলাই নিজেই সেদিন কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলো গলা ছেড়ে

—ও দাদা গো ! আমার সোনার বৌদিকে কোথায় রেখে এলে গো !

সেই ইয়ার্ড আজ জমজমাট হয়েছে। তবে অনেক শিখে-ও বলাই আজ-ও মেকানিক মিস্তিরি। আর সুধীর তার মালিক। বিজলী বলে

—ঐ মিস্তিরিটা তোমার বন্ধু ? ম্যাগো !

বিজলীর জানবার কথা নয়। প্রথম বৌ মরলো। বাপ গেল, মা গেল। সুধীরকে তখন নিত্যি বাড়ী নিয়ে গিয়ে আদর দেখাতো কালীবাবু। কালীবাবু স্যাকরার দোকান ফেঁদেছে কালীঘাটে। বয়স্থা মেয়ে বিজলীকে দেখিয়ে সুধীরকে জোর করে বিয়ে করালে। এ বৌ-কে বিয়ে করবার সময়ে কি সেই মরা বৌ-য়ের মুখ মনে পড়েনি সুধীরের? কে জানে! তবে এ কথা সত্যি, যে বিজলীর যৌবনটা-ই টেনেছিল সুধীরকে। অনেক কথা কবুল খেয়েছিল সে বিজলীর বাপের কাছে। বাড়ী আর কারবার দেবে বিজলীকে। ইন্‌-সিওরের পাঁচ হাজার টাকা। সে-ও বিজলীর।

আশ্চর্য, যে যৌবনটা আগে এমন আকর্ষণ করেছিলো, তার নেশাই গেল চট করে ফুরিয়ে। বিয়ের পর কদিন যেতে না যেতেই সুধীর বুঝলো এ নেহাৎ-ই ক্ষণিকের বিজলী। একান্ত রক্তমাংসের আবেদন আর কতদিন থাকে।

অনুভূতি যা আছে বিজলীর, তা একান্তই হিংসে ঈর্ষ্যা জড়ানো। নইলে মরা সতীনের নামটুকু পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না সে?

বিয়ের পর বলাইকে বিজলীও অল্পস্বল্প খাতির করতে চেয়েছে। সে কতখানি সুধীরের কথায়, আর কতখানি বলাইয়ের কাঁচা মুখখানার টানে, তা জানেনা বলাই। ছাপর খাটে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে বিজলী উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়েছে বলাই-এর-দিকে। বলেছে

—ব্যস্ত কেন? বিলবই নে' যেতে বলেছে তোমার দাদা, নিও খ'ন। তা ব'লে কি বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে নেই? হঁ্যা মিস্তিরি বল!

বলতে বলতে ঝুঁকেছে বিজলী। গায়ের আঁচল আলগা, অথচ তুলে নিতে ইচ্ছে নেই—এ কেমন ধারা মেয়ে? বিজলী বলেছে

—তুমি নাকি ওর অনেক কেলে বন্ধু? তা তোমাদেব পুরনো-বৌদিদি-র গল্প-সল্প একটু করনা গো' শুনি। বড্ড নাকি দজ্জাল মেয়ে ছিল?

—কে বললে ?

—কেন, তোমার দাদা ? আর দেখতেও নাকি কুচ্ছিৎ ছিল ? বলনা গো ?

খালি বাড়ী। তারা দু'জন। বিলবই নিতে এসে এমনিধারা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তা কে জানতো ? বলাই বিব্রত বোধ করে। মনের ভেতর একটা ভোঁতা রাগ জাগে সুধীরের ওপর। কালীবাবু মানুষ ভালো নয়। কাজে কর্মে ফিরতে কতবার দেখেছে বলাই কালীঘাট রোডে শ্মশানের কাকের মতো ব'সে আছে সোনা বেচা-কেনার দোকান ফেঁদে। বিপদে পড়ে ভদ্রঘরের বৌ-ঝি-রা আসছে আর জলের দামে না হোক গিল্টির দামে বেচে যাচ্ছে গিনি-সোনার গয়না। দেখেছে বিপদে পড়েছে মানুষ, আর তাকে কেমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাবু করে ঠকাচ্ছে কালীবাবু।

সেই কালীবাবুর মেয়ে বিজলীকে শান্তিলতার ঠাঁই-এ এনে বসিয়েছে সুধীর—বলাইয়ের রাগ হয় সেইজন্যে। বিজলী আজ মনিবপত্নী হয়ে বসে বসে চিপ্‌টেন কেটে আজেবাজে প্রশ্ন করছে—বলাইয়ের মন খারাপ হয়ে যায়।

এই যে বিজলীর বুকের সঙ্গে সোনার চিকচিকে হারটা উঠছে নামছে, তা-ও চোখে লাগে না বলাই-এর।

এমন সময় যদি ঠিকে ঝি উঠে আসে ? কথার পাখা কেমন করে গজায়, তা বুঝতে কি বাকী আছে বলাইয়ের ? বলাই বলে —আমারতাড়া ছিল বৌদি ! আমাকে বিলবইটা না দিন তো আমি চলে যাই !

তখন দেয় বটে বিলবই। কিন্তু আবার ঘনিষ্ঠ হতে চায় বিজলী। সুধীর একদিন নেমন্তন্ন করে বসে বলাইকে। দোষী দোষী মুখ করে বলে

—তোকে যেতে বলেছে রোববার। খাস ওখানে।

বলাইকে সেদিনও চেপে ধরেছে বিজলী। তবে নরম গলায় অনুনয়ের সুরে।

—বলনা গো, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

—ঠাণ্ডা মানুষ ছিল। হাসি খুসী—ঘরনী গিন্নি।

—বড্ড না কি বাগানের সখ ছিল ;

—ঐ ঝুমকো লতাটি তো সেই মানুষেরই পোঁতা গো!

কিন্তু বিজলীর সর্বনেশে মনের কথা কি জানতো বলাই? পরদিন দেখাগেল সেই গাছ উপড়ে কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে বিজলী। বলাই আর সুধীরকে সমুখে রেখে হাসতে হাসতে সে বললো

—না বাবু বড্ড ভয় আমার। পষ্ট দেখলাম যেন সাঁজের বেলা ধপধপে লালপেড়ে সাড়ী পরে ঐ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। এই দেখলাম যেন মিলিয়ে গেল।

তারপর সুধীরকে বললো—আমি কালীঘাট থেকে নে' আসব খন মাতুলি তাবিজ। মা বলে দিয়েছে।

কথায় বার্তায় কেমন যেন একটা ভাব। তার পরে, আর তারপরেও অনেকদিন-ই বিজলী কারখানার মানুষদের সঙ্গে ভাব করতে চেষ্টা করছে। আজ একে চোখ টিপছে, কাল তাকে পাশে বসিয়ে কাপড় কেচে ভিজে কাপড়ে এসেই গল্প করছে—পরশু তাকে নিয়ে দোকানে বেরুচ্ছে।

বলাইয়ের মনে হয়েছে সুধীরদার সেই মনপ্রাণের কিছুটা যেন শান্তিলতার সঙ্গে সাথেই ফুরিয়ে গিয়েছে, নইলে এমন করে সকল অশৈলী সয়ে কেমন করে থাকে মানুষটা? বিশবছরের ছোট বৌ ঘরে এনে কেমন ম্যাদামারা হয়েছে দেখ! শুধু তো বৌ-য়ের ব্যবহার-ই নয়, ঘর যে বৌয়ের আত্মীয় স্বজনে ভরে গিয়েছে। বৌয়ের মাসী বৌয়ের পিসী বৌয়ের দুইকুলের জ্ঞাতিগোষ্ঠি এসে জুড়ে বসেছে।

সুধীর যেন দেখেও দেখেনা কিছু। সবচেয়ে সর্বনেশে ব্যাপার হয়েছে ওই সুবলের আমদানি। বিজলীর পেয়ারের ভাই সুবল। বাপের ঘরে থাকতে লেখাপড়া ছেড়ে ফিটার মিস্তিরির কাজ শিখতে গেছল। বাউণ্ডুলে ছেলে একটা। বোনাই এর বাড়ী এসে তার গায়ে উঠেছে আদ্দির জামা। চুল স্যাম্পুতে রুক্ষ, পায়ে বাটার রবারের চটি—মুখে স্নো পাউডার।

কারখানার ছোকরা মিস্তিরি বলাই-এর সাথে রসালো ভাব জমাতে গিয়ে ঘা খেয়েছে বিজলী। তাই সুবলকে বসিয়েছে কারখানাতে যেন বলাইয়ের উপর খানিকটা শোধ নেবার জন্যেই। সুধীরের কারখানায় সুবলের চেয়ে বলাইয়ের জোর অনেকখানি। তার কথায় বলতে গেলে ওঠে বসে সুধীর। বিজলীর রাগ সেই কারণে। সুবলকে কি ওস্কানি দেয় তা সে-ই-জানে। সুবল এসে মিন্‌মিনে সরু গলায় লাগায় দিদির কাছে। বিজলী সুধীরকে বলে সুবিধে করতে পারে না—সুযোগ পেলে-ই বলাইকে বলে

—বাবু কিছু দেখেনা কো! তাই বলে তুমি ভেবনি যে সুবলকে চোপা করবে। সুবল তোমার মনিব নয়?

এক দিন বলাই ক্ষেপে থাকে। বিজলীর কথার তখন কোন জবাব করেনা। অন্য কোন সময় সুধীরের বাসাতে-ই কোন কাজের কথা কইতে এসে বলে

—জানলে দাদা? তোমার ইস্তিরি সে দিন বলেছে কি, যে তোমার শালার ঠেঙে সব শুনেমেলে নিতে হবে।—বলেছে, সুবল মোদের মনিব গো।

বিজলীর সামনেই বলে বিজলীকে অপ্রস্তুত করে। সুধীর শালাকে নিয়ে পড়ে তখন।

হঠাৎ মুখখোলে যখন, তখন ধুয়ে দেয় মান ইজ্জত।

বলে—দিন চোদ্দঘণ্টা খেটে কাজ শিখিছি। ঐ বলাই মিস্তিরি আমার লক্ষী জানবে। স্রেফ ওর টানে এখানে কত বড় বড় মক্কেল

আসে তা জানো ? কাজ শিখতে হয় কাজ শেখো। বেটাছেলে অমন পমেটম মেখে ঘোর কেন ? বাবুগিরির কড়ি খর্চা জোগাতে পারব না বাবু, হ্যাঁ।

লাভের মধ্যে সুবল সুধীরের-ই পকেট মেরে সেদিন মেজাজ দেখিয়ে হোটেলে খেতে যায়। বলে—অচ্ছেদ্দার ভাত বাবু খাবনা।

আর বিজলী সেদিন মনের দুঃখে সিনেমা যায়। সিনেমায় নায়িকার দুঃখকষ্টের সঙ্গে নিজের আদল খুঁজে মনগড়া আদিখ্যেতায় ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে কিছুটা। তারপর মাসীর বাড়ী পান্তভাত খেয়ে এসে না রেঁধে বেড়ে শুয়ে থাকে।

অনেক রাতে যখন ফেরে সুধীর তখন সেই বৌয়ের-ই মান ভাঙ্গাতে হয় তাকে। সেই শালাকে-ই পয়সা দিয়ে পাঠাতে হয় লালার দোকানের পুরীমিষ্টি আনতে। এই সব দাম দিলে পরে, তবে বিজলী একটু ঘনিষ্ঠ হতে দেয়। আবার কদিন মিলমিশ দেখা যায়।

দেখে দেখে তাজ্জব হতো বলাই আগে। এখন তার আর অবাক লাগেনা। সে শুধু ভাবে শান্তিলতার কথা। সেই যে একটা মানুষ ছিলো, যে পাঁচ বছর সুধীরের সুখদুঃখ দেখে শুনে বুকদিয়ে আগলে রাখতো ঝড়ঝাপট—তার কথা কি সুধীরের একবার ও মনে পড়ে না ?

শান্তিলতা ছিল নেহাৎ-ই একটা ভালবাসার মেয়ে। স্বামীকে ভালবাসতো। বলাইদের আবদার সইতো। বলাই এসে বলতো

—বৌদি মাংস প্যাঁজ দে গেলুম। দাদার সঙ্গে চড়ুইভাতি করতে যাব মোরা। রেঁধে রেখো।

ঘেমো মুখে হাসি মেখে শান্তিলতা বলতো

—আজ আলুর দম, কাল মাংস, পারিনে বাবু। এবার বে কর দিকিনি ঠাকুর পো ?

—ভাল মনে করেছ। এই টাকা বৌদি। আলু এনে দম-ও করে দিও দিখিনি !

—কে দেবে রাঁধুনির দাম ?

—দাদা দেবেখন।

যে মানুষগুলো ঢেলে ঢেলে ভালবাসে, তাদের-কে ফিরে কিছু দেবার কথা কারু মনে পড়ে না। শান্তিলতার জন্যে তাই সুধীরও কিছুই নিয়ে আসতো না! বেলকুঁড়ি কাঁটা বা মাছ চাবি-রিং দিয়েই খুসী করা যেতো তাকে—তবু সেটুকুও খেয়াল হতো না সুধীরের।

আজ সুধীর বিজলীর জন্যে কত কি বয়ে বয়ে আনে ?

ফর্সাপান্‌সে রঙ সাধারণ চেহারার একটি মরা মেয়ের মুখ যেন আজও মনে পড়ে বলাইয়ের। মনে হয় এই সুসমৃদ্ধির গোড়াটুকু বেঁধে দিয়ে মরে গেছে বৌদিদি। মনে হয় সে বৌ টাকে সুধীর তেমন ভালবাসেনি। অথবা কোন দাবী করতে জানতো না বৌদি জীবনে। মরে-ও গেল তেমনি টুপ করে। আর মরে গেল না শুধু—এমন করে ঝরে খসে গেল যে, বিজলী এসে স্বচ্ছন্দে তার ঠাঁই নিতে পারলো।

সন্ধ্যেবেলা গা ধুয়ে উগ্র হেনা সেণ্ট মেখে আজও বিজলী সুযোগ খুঁজে বলাইয়ের গা ঘেঁষে আসে। বলে

—আর এট্টু রয়ে গেলে পারো। আঁধারে যেন ভয়ভয় করে।

কাকে ভয় ? কিসের ভয় ? বলাই বলে—সে ভাগ্যিমানি সগ্‌গে গেছে। ভয় দেখাতে আসতে বয়ে গেছে তার।

—তুমি বুঝবেনাকো।

বলে যৌবনের শরীরটা নাড়িয়ে বিজলি হাসে। বেশ স্থূল মালিকানার হাসিমাখা মালিকের বৌ। সেই অধিকার বোধেই যেন এমনি সব অশৈলী করে বিজলী। বলাই বলে—এর ওষুধ আমার জানা আছে। কাজে কর্মে মন দিলে আর ভয় থাকেনা।

চলে আসতে আসতে বলাইয়ের মনে হয়, বিয়ে হয়ে আসতে না আসতে বিজলা লঙ্কাপোড়া সরষে পোড়া লোহার শলা আর চুলের নুটিতে সিঁদুর গোলা দিয়ে তুক্‌তাক করেছিলো। সেই দেখেই যেন

মনস্তাপে নিজের ঘর সংসার থেকে ছায়াটুকু-ও সরিয়ে নিয়েছে বৌদি! কই, সুধীরদা তো একসময় বলতো

—আমি পষ্ট জানিয়ে বলাই, তোর বৌদি আমাকে নিত্যি দেখে যায়।

হয়তো আসত্তো শান্তিলতা। কল্যাণকামী একটা ছায়াশরীর ছায়ামন নিয়ে ঘুরে বেড়াতো বাড়ীখানায়। তারপর আর আসে না। পরের মেয়ে বিজলীর অশিক্ষা অসভ্যতার চেয়ে সুধীরের বিস্মৃতিই তাকে হয়তো ব্যথা দিয়েছে বেশী। বলাই পষ্ট বুঝতে পারে, সেই জন্যেই যেন সুধীরদা-র পুরণো রান্নাঘরটার চালে বসে স্নেহমমতা বিহীন রুক্ষ পরিবেশে লক্ষীপ্যাঁচা আর ডাকে না।

॥ তিন ॥

সুধীর আর তেমনটি নেই। বলাই ও বদলিয়েছে। সংসার করেছে। বলাইয়ের সুখশান্তির চাবিকাটি বাঁধা আছে একান্তই তার বৌয়ের আঁচলে। বৌয়ের নাম ভোমরা। ভোমরার মতোই গুন্ গুন্ করে কাজেকর্মে চরকি খেয়ে বেড়ায় বৌ ছোট বাড়ীটিতে আর সারা দিনমান কাজকর্ম সেরে এসে ভোমরার মতোই চোখমুদে মিলিয়ে থাকে বলাইয়ের বুকখানাতে।

বলাইয়ের পরিবারের ইতিহাসে বিয়েকরা বৌ-কে এমন ধারা ভালবাসার নজীর নেই। জগুবাজারের কাছাকাছি যে গলিটিতে তার বাসা, সে হলো মোটর মিস্তিরির পাড়া। ছোট ছোট রিপেয়ার সপের সুমুখে বসে থাকে মালিক। কারিগররা বলাইয়ের অনেক দিনের বন্ধু। এই পাড়াতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাসান্তে পাঁচটাকা ঘরভাড়া দিয়ে জজবাড়ীর অমরবাবুর ভাড়াটে হয়ে রয়েছে সব। একই কলে চান। একই জলের আগুপিছু নিয়ে মেয়ে বৌতে চুলোচুলি ঝগড়া। রাতের বেলা রাস্তার ওপর সাবান কেচে নেওয়া আর গরম কালে ফুটপাথে খাটিয়া পেতে শোওয়া।

সকলের একজন হয়েও বলাই বিশিষ্ট। শানের মেঝে খোলার চালে তার নিজের বাড়ি। আর বৌ তার ভালবাসার বৌ। একজনের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল বলাই দক্ষিণেশ্বর। ছোট খাটো শাম্‌লা মেয়েটি নাম তার ভোমরা। বরের সঙ্গে আর বরযাত্রীদের সঙ্গে রসিকতা করছিল সে। সেই দেখে মেয়ে পছন্দ করে এলো বলাই।

চোখের দেখায় ভালোবাসা আর বিয়ের তিন বছর না ঘুরতে দুইটি

ছেলের মা হয়েছে ভোমরা। তবু বলাই বলে আমার ভালোবাসার বৌ।

এই বলাই বৌ-কে জল বয়ে এনে দিচ্ছে। জিলিপী কিনে খাওয়াচ্ছে গরম গরম। দুটো বাচ্ছাকে মা-র কাছে জমা রেখে দুজনে রূপালী-তে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।

আবার কুটোগাছখানা থেকে খণ্ডপ্রলয় বেধে যায়। দুজনে মিলে চুলোচুলি, কামড়াকামড়ি। বৌ-কে হয়তো বলাই পিটেই দিলো।

পাড়াপড়শী যখন সোহাগ জানাতে এলো। তখন বৌ ফুঁসে উঠলো

—আমার বর আমাকে মেরেছে, তোদের কি লো?

আবার রাত নাগাদ দেখাগেল দুজনে হাতধরাধরি করে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। ঠিক যে এর হাতে ওর হাতে ধরা আছে তেমন নয়। তবে ভাবখানা সেই রকমই।

রাত্তির বেলা শুয়ে ভোমরার কথাবার্ত্তা ধৈর্য ধরে শুনতেই হয় বলাইকে। —জজবাড়ীতে যে বৌ এয়েছে, এমন সোন্দরী, জানলে? আজ টিপকলে জল নিচ্ছি, তা জানলা দে তাকিয়ে আছে বৌ। আমারে অমন ডাকলে হাতছানি দে'।

—তুই গেলি?

—যাবনা তো কি? গেনু জানলার নীচে। তা বৌ বলে কিনা—শুনছেন ভাই...বুঝলে? আমার তো ঠেলে হাসি আসতে লেগেছে আপনি আজ্ঞে শুনে...

—ধুর হাবি, ভদ্দরঘরের বৌ ব'লে জানেনা তোকে! কার ব্যাটার বৌ তা জানিস?

—তা আর জানিনি? শ্বশুর আমার একটা মস্তো মানুষ ছিল।

—বুকখানা বড় ছিল রে! সে থাকলে তোরে অমন টিপকলে জল বইতে দিতো না।

তারপর শোন না—বৌ বললে আপনাদের ডালিম গাছটার প'রে

॥ তিন ॥

সুধীর আর তেমনটি নেই। বলাই ও বদলিয়েছে। সংসার করেছে। বলাইয়ের সুখশান্তির চাবিকাটি বাঁধা আছে একান্তই তার বৌয়ের আঁচলে। বৌয়ের নাম ভোমরা। ভোমরার মতোই গুন্ গুন্ করে কাজেকর্মে চরকি খেয়ে বেড়ায় বৌ ছোট বাড়ীটিতে আর সারা দিনমান কাজকর্ম সেরে এসে ভোমরার মতোই চোখমুদে মিলিয়ে থাকে বলাইয়ের বুকখানাতে।

বলাইয়ের পরিবারের ইতিহাসে বিয়েকরা বৌ-কে এমন ধারা ভালবাসার নজীর নেই। জগুবাজারের কাছাকাছি যে গলিটিতে তার বাসা, সে হলো মোটর মিস্তিরির পাড়া। ছোট ছোট রিপেয়ার সপের সুমুখে বসে থাকে মালিক। কারিগররা বলাইয়ের অনেক দিনের বন্ধু। এই পাড়াতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাসান্তে পাঁচটাকা ঘরভাড়া দিয়ে জজবাড়ীর অমরবাবুর ভাড়াটে হয়ে রয়েছে সব। একই কলে চান। একই জলের আগুপিছু নিয়ে মেয়ে বৌতে চুলোচুলি ঝগড়া। রাতের বেলা রাস্তার ওপর সাবান কেচে নেওয়া আর গরম কালে ফুটপাথে খাটিয়া পেতে শোওয়া।

সকলের একজন হয়েও বলাই বিশিষ্ট। শানের মেঝে খোলার চালে তার নিজের বাড়ি। আর বৌ তার ভালবাসার বৌ। একজনের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল বলাই দক্ষিণেশ্বর। ছোট খাটো শাম্‌লা মেয়েটি নাম তার ভোমরা। বরের সঙ্গে আর বরযাত্রীদের সঙ্গে রসিকতা করছিল সে। সেই দেখে মেয়ে পছন্দ করে এলো বলাই।

চোখের দেখায় ভালোবাসা আর বিয়ের তিন বছর না ঘুরতে দুইটি

ছেলের মা হয়েছে ভোমরা। তবু বলাই বলে আমার ভালোবাসার বৌ।

এই বলাই বৌ-কে জল বয়ে এনে দিচ্ছে। জিলিপী কিনে খাওয়াচ্ছে গরম গরম। দুটো বাচ্ছাকে মা-র কাছে জমা রেখে দুজনে রূপালী-তে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।

আবার কুটোগাছখানা থেকে খণ্ডপ্রলয় বেধে যায়। দুজনে মিলে চুলোচুলি, কামড়াকামড়ি। বৌ-কে হয়তো বলাই পিটেই দিলো।

পাড়াপড়শী যখন সোহাগ জানাতে এলো। তখন বৌ ফুঁসে উঠলো

—আমার বর আমাকে মেরেছে, তোদের কি লো?

আবার রাত নাগাদ দেখাগেল দুজনে হাতধরাধরি করে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। ঠিক যে এর হাতে ওর হাতে ধরা আছে তেমন নয়। তবে ভাবখানা সেই রকমই।

রাত্তির বেলা শুয়ে ভোমরার কথাবার্ত্তা ধৈর্য ধরে শুনতেই হয় বলাইকে। —জজবাড়ীতে যে বৌ এয়েছে, এমন সোন্দরী, জানলে? আজ টিপকলে জল নিচ্ছি, তা জানলা দে তাকিয়ে আছে বৌ। আমারে অমন ডাকলে হাতছানি দে'।

—তুই গেলি?

—যাবনা তো কি? গেনু জানলার নীচে। তা বৌ বলে কিনা—শুনছেন ভাই...বুঝলে? আমার তো ঠেলে হাসি আসতে লেগেছে আপনি আজ্ঞে শুনে...

—ধুর হাবি, ভদ্দরঘরের বৌ ব'লে জানেনা তোকে! কার ব্যাটার বৌ তা জানিস?

—তা আর জানিনি? শ্বশুর আমার একটা মস্তো মানুষ ছিল।

—বুকখানা বড় ছিল রে! সে থাকলে তোরে অমন টিপকলে জল বইতে দিতো না।

তারপর শোন না—বৌ বললে আপনাদের ডালিম গাছটার প'রে

আমার একটা জামা উড়ে গে পড়েছে—দেবেন ভাই ? বল্লুম তা আর দেবনা কেন ? পরের জিনিষে আমার কাজ কি ভাই ? বলে চলে এইছি। আরও খপর এই খিরিস্তানদের আল্লাদী মেয়ে আবার ভাতারের ঘর ছেড়ে চলে এয়েচে, জানলে ? বলে তাদের বাড়ীতে নাকি ইঁদেরা ! বৌকে চানের জল তুলে দিতে বলেছিল। বরটা এয়েছিল। সে ঢং যদি দেখতে !

—কি বললো ?

—কত ঢঙের কথা ! দুজনে এসে এই পার্কের ফুটপাথে দাঁইড়ে—

—দাঁইড়ে নয়রে দাঁড়িয়ে, বল দাঁড়িয়ে।

—ওই হলো ! দুজনে দাঁইড়ে—নমিতাদিদি ঝ্যানো নিমরাজী গোছের ফিরে যেতে—রাগ পড়েগেছে অনেকক্ষণ, এখন ওর দজ্জাল মা ওস্‌কানি দিচ্ছে আর কি ! জামাইয়ের সঙ্গে ছাড় করিয়ে আর এক ঝনের সঙ্গে 'বে', দেবে।

—ওদের অমন হয় !

—ঝানি বাবু, বকোনি ! শোননা...নমিতাদিদি দাঁইড়ে রইলো—জামাইটা বলছে আমি তোমারে জল টেনে দোব—আমি তোমার অপিসে টিফিন দে আসবো—আমি চাকর না আসাতক্ হোটেল থেকে খাবার নে' দেব তুমি শুধু ফিরে চল। তুমি হাত পুইড়ে খেওনি, কষ্ট করে জল টেননি।

জল টেননি—তুমি শুধু আমার সুমুখে থাকো ! বে'-র আগে এত সোয়াগ সব ভুলে গেলে ? হ্যাঁ নমিতা, তোমার জাত এমন নিষ্ঠুর ?—হেসে বাঁচিনি বাবু। আমি আর পঞ্চোদিদি শুনছি আর হেসে গইড়ে যাচ্ছি। বরটা তারপর বলে কি—টিকিট নে' এইছি চল সিনেমা যাই। তখন ঐ পোড়ারমুখী বলে কি—কাপড় বদলে আসি ?

ভোমরার এইসব কথার কল্‌কলানি শুনতে বেশ লাগে বলাইয়ের। বড় ছেলেটাকে নিয়ে মা শোয় ছোট খুপরি ঘরে। ছোট ছেলেটাকে একপাশে শুইয়ে থাবড়ায় ভোমরা। তারপর হাইতুলে বলে—আর

বকতে পারিনি বাবু। কাল মা আবার কি বর্তো করেছে—সাতসকালে জোগাড় দিতে হবে।

—তো ঘুমোনা কেন? দিনমান খাটবি, রাতে ঘুম আসে না কেন? যতো রাজ্যের ছেঁড়া কথার ছালা খুলে ধরিস?

—রাত ছাড়া যে তোমাকে পাইনা বাবু? কারসঙ্গে কথা কইব বল দিখি? মা তো সোয়াগের নাতি নে ব্যস্ত। একটা কথা কইলে কানে আঙুল দেয়। বলে তার মাথা নাকি ঘুরে যাচ্ছে।

—মা-র মাথার ব্যথা জানিস্‌না?

—মা ছেলে এক ধাতের বাবু, তুমি-ও কথা শুনতে ভালবাসোনি। ঝাক্‌গে ঘুমোলুম!

ভোমরার কথা শুনে প্রথমটা হাসি পায় বলাইয়ের। দিনরাত কথাবার্তা রঙ্গরস ছাড়া থাকতে পারেনা বৌ। তবে একেবারে নিরলস। বলাই-য়ের ভাঙ্গাঘর দোরে শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছে। আট হাত বাই চার হাত দেয়ালটাতে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর ভীড়। লক্ষী ভগবতীর ছবি সিঁদূরের ফোঁটায় ঢাকা। আবার চতুর্ভুজা মহালক্ষী বা গণেশ মহিমার ছবিতে বোম্বাইয়ের ছাপ। ওপাশে দেখা যায় ভারতের ম্যাপথেকে ভারতমাতা বেরিয়ে এসে নতজানু শিবাজি ও স্নভাষবসুকে তরবারি দিচ্ছেন! একপাশে কার্পেট সূতোয় ফোঁড় তুলে লেখা আছে।

'—জীবে সেবা করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

সাড়ে ছ'আনার ব্র্যাকেটে ভোমরার চিরুনি ফিতে সিঁদুর কৌটা। লুঙ্গিকেটে জানলায় পর্দা দেওয়া। বাক্সে পাড়ের ঢাকনা। দেওয়ালের আলমারীতে নানাবিধ জিনিষ ঘরসাজানো হিসেবে সমবেত করা হয়েছে। যথা—কাপড়িস, প্লাসটিকের পুতুল ঘরের টেবিল চেয়ার, সস্তার ফ্লাস্ক, চড়কের মেলায় কেনা মাথা নাড়া বুড়ো পুতুল, চামচ, পালকের ফুল ইত্যাদি।

ভোমরার দুটিহাত সারাদিন কাজ করে চলে। ঘরেদোরে এতটুকু ধুলো নেই। উঠোনটুকু তক্ তক্ করছে। ডালিম গাছের তলায় এতটুকু তুলসী মঞ্চ। চৌকির ওপর কুঁজো ভরা ঠাণ্ডাজল। ঝকঝকে কাঁসার গেলাস। হাতপাখায় লালশালুর ঝালর। পাটিখানার দু' পাশে কাপড় দিয়ে মোড়া। বলাইয়ের মাকে নড়ে বসতে হয় না। সকলে বলে—ভাগ্য গুণে বৌ পেইছিলে খুড়ি মা!

—সউরে মেয়ে, ভদ্দরঘরের মেয়ে—আমাদের মতো অজগো পাড়াগেঁয়ে তো নয়?

গর্বভরে বলে বলাইয়ের মা।

বলাইয়ের মনে হয় সারাদিনমান উড়ে উড়ে ঘুরে এখন ভোমরা বাসায় এসে চোখ মুদেছে। রাত্রি গাঢ় হয়েছে। পাড়াটা নিশুতি হয়েছে। এমনকি মোক্তার বাড়ীর পিসী যে রাত বাড়লে এ্যাক্সিডেণ্টে মরা ছেলের জন্যে দুইবছরের পুরনো শোকটা বুকের কোটর থেকে বের করে কাঁদতে বসে—সে গুণগুণানি-ও শোনা যায় না।

বলাইয়ের চোখে ঘুম আসে না। এমনি সব সময় খোলার চালের ঘরে শুয়ে আঁধারের দিকে চেয়ে তেলাপোকার ডানার ফরফরানি শুনতে শুনতে তার মোটর মিস্তিরির বুকের মধ্যে দুরাশা একটা মুচড়ে মুচড়ে মরে। আঁধারের দিকে চেয়ে থাকে বলাই। চার হাজার টাকা এনে দেয় কেউ, তবে বলাই কি করে? বলাইয়ের মাথার মধ্যে ভোমরার মতো ফুরফুর আর একটা সোনালী কালোয় রংবাহারী চিন্তা ঘুরে বেড়ায়।

একখানা বেবি ট্যাক্সি! মোটর মিস্তিরির জীবনের এক আশ্চর্য স্বপ্ন। এই স্বপ্নের বাসা বলাইয়ের পাঁজরগুলোর মধ্যিখানে। প্রথমে স্বপ্নটা ছিলো এই এতটুকু! মোটরমিস্তিরির অবহেলিত জীবনের দুঃখবেদনা, অনেকদিনে অনেক সময়ে এই স্বপ্নের অঙ্কুরে সেচন করেছে বলাই। তাতেই বড় হয়েছে স্বপ্নটা। এখন এমন হয়েছে যে স্বপ্নটা যেন সত্যি হয়ে উঠেছে। এমন সত্যি হয়েছে, যে বলাইয়ের মনে

হয় ট্যাক্সিটা অধৈর্য হয়ে হর্ণ বাজাচ্ছে। আর কেউ শুনছেনা। বলাইয়ের জন্যেই বাজছে হর্ণ, আর বলাইকেই ডাকছে ট্যাক্সিটা। হর্ণের ভাষায় বলছে—জোগাড় করো টাকা। কিনে নাও আমাকে।

একখানা হিন্দুস্থান মডেল বেবিট্যাক্সি। কোন দেবদেবী নয় বা পাড়ার গোপাল-ভবনের কর্তার মতো লটারীতে কপাল ঠোকা নয়—একখানা বেবিট্যাক্সি পারে বলাইকে এই অবহেলিত জীবনের সকল গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে। বলাই তো এখন আর সেই বলাই নেই, যে নিতাইচাঁদের হাত ধরে বাপের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বকর্মাপূজোর দিনে মনোহর-পুকুরে ঘুড়ির লড়াই দেখতে যেতো। ফেরার সময়ে বাপের কাঁধে চড়ে আসতো। একহাতে ঘুড়ি অন্য বগলে লাটাই নিয়ে। বাপ যখন অভিজ্ঞ চোখে ঘুড়ির কল বেঁধে দিতো—আর সেই ঘুড়ি নর্দান পার্কের মাঠে বাতাসের মুখে জোর পাল্লা নিতো, তখন বলাইয়ের মনে হতো এই বাপ-ই তার কাছে দেবতা। বলাই তখন ছোট ছিলো।

বলাই এখন আর সেই বলাই নেই যে সুধীরদা'র মুখের পানে চেয়ে দিন কাটাতো। মনে পড়ে সুধীরদাদা গান গাইছে গঙ্গার ধারে বসে

—'জাননারে মন! পরম কারণ!
শ্যামা কভু মেয়ে নয়!'

আর মুগ্ধ হয়ে শুনছে বলাই। মনে পড়ে কিরপাল সিং মরে গিয়েছে। খাটিয়ায় তার বুড়ো মজবুত শরীরখানা শুইয়ে দিয়ে গ্রন্থসাহেব পড়ছে এক বুড়ো শিখ! দেখছে আর চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে বলাইয়ের চোখ। মনে হচ্ছে আর কোনদিন কাজের শেষে কিরপাল গ্রীজমাখা হাতে তার পিঠ চাপড়ে তারিফ করবে না। নিজে মদের গন্ধে ভুরভুর টকটকে লাল মুখখানা নাবিয়ে এনে এ কথা বলবে না যে—মদ বড়ো শয়তান জিনিষ। কখখোন খেও না বলাই! আগে আমি মদ খেতাম। এখন মদই আমাকে খেয়ে নিচ্ছে। একদিন কিরপাল দেখবে লাশ হয়ে গেছে। তুমি ভাল ছোকরা। কাজ শেখো!—সেই দুঃখের দিন

সুধীরদাদা-ই তাকে চায়ের দোকানে বসিয়ে কত আদর করে খাওয়াচ্ছে। বলছে—তুই আমি পাটনারশিপে ব্যবসা করবো। দেখিস বলাই!

শুনছে আর বলাইয়ের চোখে সুধীরকে মনে হচ্ছে দেবতা। আজ আর সেদিন নেই। সবই আছে, শুধু হিসেবটা দারুণ ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। তখন বলাই কিশোর ছিল।

এখন বলাই একজনের ছেলে, একজনের স্বামী, আবার নিজের-ও তার দুটো ছেলে আছে। বেণুর চোখে ত বলাই-ই সব। ভোমরার চোখেও আর অন্য মানুষ নেই। তার বুড়ো মা, সে-ই বা কার দিকে চেয়ে বসে আছে?

এতজনের দায়িত্ব তার পরে বর্তিয়েছে। বলাই আর মোটর-মিস্তিরি মাত্র হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। কারিগরের ভাতের অভাব নেই। সে কথা সত্যি, আর এও সত্যি সুধীর তাকে খাতির করে আজও। কিন্তু সে খাতির তো শুধু শুধু নয়? বলাইয়ের দাম সুধীর জানে। কারখানার মক্কেল-রা যে আসে তারা শুধু বলাইয়ের নাম শুনেই আসে। বালিগঞ্জ প্লেসের মজুমদার আর বার্মাশেলের জেঙ্কিন দুজনের একজন-ও বলাইকে না দেখলে ঢুকবেনা। মুখ ঘুরিয়ে নেবে গাড়ির। তারা আর কিছু চাইবেনা। বলাইকে পেলেই নিশ্চিন্ত। আর এদের সূত্র ধরে নতুন নতুন মক্কেল এসেছে সব কারখানায়।

রিপেয়ারের কাজেই সুধীরের আসল রোজগার। তাই বলাইকে সে কোন দিন-ও চটাবেনা। জুয়েল মোটর সার্ভিস ঘর বেঁধেছে দুষমণের মধ্যে। আশে পাশে সরিকী শত্রুতা। জুয়েলের বাঁ পাশে রুবি মোটর রিপেয়ার শপ্ আর ডান পাশে দি নন্দী মোটর্স-এর জাঁকালো ইয়ার্ড। সুধীর কি জানেনা যে এই দুটো কোম্পানীর যেখানে যাবে বলাই সেখানেই লুফে নেবে তাকে? সুধীরের টাকার জোর তার প্রতিবেশী প্রতিযোগীদের চেয়ে কম। তবে সুধীরের জোর তার মেকানিক বলাই!

সম্প্রতি সুধীর সরকারী মহলে খুব পা রগড়াচ্ছে। সরকার

অনুমোদিত মোটর ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট লেখা বোর্ড একখানা টাঙাতে চেষ্টা করছে। তাতেও মন্দ পয়সা নয়। আজকাল জোর কম্পিটিশনের বাজার। মেয়েরা অবধি গাড়ী চালাতে শিখছে।

না, বলাইকে সুধীর চটাতে চায় না। কিন্তু বলাই এখন মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচতে চায়। নিজেই হতে চায় মালিক। সে কি জানে না, যে চেষ্টা করলে চন্দ্রমাধব রোডে বা বেলগাছিয়াতে সে স্বচ্ছন্দে চাকরি পেতে পারে সরকারী ওয়ার্কশপে? সেদিকে ধরাধরি করবার মানুষ তার রয়েছে। কিন্তু চাকরী চায় না বলাই।

সে চায় একখানা ট্যাক্সি কিনতে। মালিকের হয়ে নিজে চালাতে চায় না। মালিকের ট্যাক্সি চালালে দিন দু'টাকা খাই খরচা, আর শ'য়ে পনেরো তার। কিন্তু ড্রাইভার হয়ে কি হবে?

একখানা ট্যাক্সির মালিকানা তাকে এইসব কিছু থেকে ছিঁড়ে নিয়ে স্বাধীন জীবনের এক্তিয়ার দিতে পারে। একখানা ট্যাক্সি তার ঘরখানার ফাটাফুটো ঢেকে দিতে পারে। ভোমরা-র হাতের ব্রোঞ্জের চুড়ি ক-গাছা বদলে সোনার চুড়ি দিতে পারে। আর ঐ যে বেণুর পা দুখানা একটু রোগা—হাঁটতে গেলে টলে যায়—ডাক্তার বলেছে কডলিভার খেতে, আঙুর আপেল খেতে—একখানা ট্যাক্সি পারে বেণুর চেহারাটা সুন্দর করে দিতে। বলাইকে ঘিরে নিতাই চাঁদের অনেক স্বপ্ন ছিলো। সে সব স্বপ্ন ভেসে গেছে। নিতাইচাঁদ এই জীবনের অনেক হতাশা আর পরাজয়ের কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে গিয়েছে। বলাই কি জানে না যে তার নিজের পা দুখানি ও অমনই কাদায় পোঁতা! অমনই চোরাবালি তাকে নিরন্তর টানছে? একখানা ট্যাক্সি হয়তো তাকে মুক্তি দিতে পারে।

সাত পাঁচ ভেবে বলাই ঘুমিয়ে পড়ে। তার ঘুমন্ত মাথাটা তেলচিটে বালিশে হেলে পড়তে পড়তে প্ল্যান ঠিক করে রাখে। সুধীরের কাছেই যাবে।

॥ চার ॥

মজুমদার সাহেবের গাড়ী রিপেয়ার-ই শুধু নয়, তার একমাত্র ছেলেকে জানে বাঁচিয়েছে বলাই। বলাই সামনে না থাকলে ছেলে সেদিন মরে যেতো নির্ঘাৎ গাড়ী চাপা পড়ে। বাঁচাতে গিয়ে-ই মজুমদারের গাড়ী ভাঙলো। মজুমদার কিন্তু সে ক্ষতির চেয়ে উপকারটাকে মনে রেখেছেন অনেক বেশী। কথা দিয়েছেন যেমন করে হোক বলাইকে বেবিট্যাক্সির পারমিট একখানা বার করিয়ে দেবেন। বলাই বলেছে—আমার সার টাকার জোর নেই। পেট মোটা করে দিতে পারবোনা আমি নোট খাইয়ে। তা বলে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

আজ সকালে মজুমদারের কাছ হয়ে বলাই সোজা সুধীরের বাড়ী গিয়ে ওঠে। বলে—চার হাজার টাকা তোমাকে দিতেই হবে। এতকাল কথা দিয়ে রেখেছ, আমি কথা কয়ে এইছি।

—পারমিট তো পাস্‌নি এখনো ?

—কে বললে ?

পারমিট পেয়েছে বলাই ? এই বাজারে বেবিট্যাক্সির পারমিট একখানা বের করেছে ? বিশ্বাস করতে গিয়ে হঠাৎ এই প্রথম, সুধীরের বুকখানা যেন হিংসেয় জ্বলে যায়। বলে

—এই বাজারে বের করে আনলি একখানা পারমিট ?

বলাই সুধীরের কাছে আজ-ও মনের কথা গোপন করে না। বলে

—মজুমদারের কাছ থেকে এই আসছি। মজুমদার বললে—চার হাজার টাকা জোগাড় করো বলাই। পারমিট একখানা আমি তোমাকে

করিয়ে দোবই দোব। বেবিট্যাক্সির একখানা পারমিট—সে ধরো তোমার হয়ে রয়েছে। সে ঝ্যামন করে হোকনা কেন। তা মা বুড়ী বাড়ী মটগেজ দেবেনা কো! বাড়ী মা-র নামে, জান তো? আমার ঝে হক্ নেই তা নয়। কিন্তু পুরুষবাচ্ছা হয়ে আমি বা কেমন করে বুড়ীকে ধোঁকা দে' বাড়ী মটগেজ রাখি বল দিখিনি!

টাকা যে কেমন করে শোধ দেবে বলাই সে কথা শুধোয় না সুধীর। কে না জানে যে বেবিট্যাক্সি মানে অনেক টাকা? তবু বলে

—ধারকর্জ করে বেবিট্যাক্সি নে' কি হবে বলাই?

—কেন, তুমি রংলালকে দেখনা কেন। এক ট্যাক্সি থেকে না লাল হয়ে গেল?

—সে তার শ্বশুর এক কথায় চার হাজার টাকা দিলে, তাই না? এখন সে ট্যাক্সি না নিজের হয়েছে?

—আমার ট্যাক্সি-ও আমারই হবে। প্রথম বছরটা নয় কষ্ট করে রইব। খেয়ে না খেয়ে। কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা শোধ করবো। টাকা শোধ হলে পরে তো গাড়ী আমার! না কি বলো?

উৎসাহে বলাইয়ের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। ঝুঁকে পড়ে বলাই বলে

—দেখনা কেন, কি করে ফেলি আমি?

সুধীর ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে

—উকিলবাড়ী খবর নেব বলাই। লেখাপড়া তো করতি হবে একটা?

—লেখাপড়া কি সুধীরদা? শেষকালে কোন মাসে টাকা শুধতে পারবো না আর তুমি আমার সঙ্গে কোর্টঘর করবে?

—তোর সঙ্গে আমার সেই সম্পক্ক?

—তো লেখাপড়ার কথা বলছ কেন?

—আমার আবার দশজনকে নে' কারবার কি না! সবটাই তো মাথায় রাখতে হবে আমাকে।

—আমি আবার গাড়ীর ধার-ও শুধব কিনা! হায়ার পারচেজের গাড়ী—জান তো মাস গেলে সাড়ে তিনশো টাকা দিতেই হবে আমাকে! তুমি ঝা হয় একটা ধার নাও।

—তুই মাসে মাসে দুশো ক'রে ঝদি দিস্ বলাই, খরচা তোর উঠে যাবে।

—মাস গেলে দুশো?

বলাইয়ের মনটা ভারী হয়ে গেল পলকে। তারপর বললো

—তাই ভাল সুধীর দা! একবছর আট মাসে শুধে যাবে দেনা। নিজে-ও অবসর হতে পারবো খ'ন!

বলাই চলে গেলে পরে সুধীর কিছুক্ষণ বসে রইলো। প্রথমটা হিংসে হয়েছিলো বটে। এখন মনটা ঠিক করে ফেলেছে সে। বলাইয়ের কাছে সে-ও দেনদারী। টাকা পয়সায় নয়, অন্য ব্যাপারে। টাকাপয়সায় নয়ই বা কেন? ফ্রেঞ্চ মোটরের কাজ ছেড়ে অম্বিকাবাবু জলপাইগুড়িতে কণ্ট্রাক্টরী নিয়েছে। সে বলাইকে খুব সেধেছিলো। জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি দার্জিলিঙ্-এর রাস্তায় অম্বিকাবাবুর ট্যাক্সি আছে কখানা। চা বাগানের মালিকরা হরদম যাচ্ছে আসছে। কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি। সেবক ব্রিজের আগে আর পরে পাক খাওয়া রাস্তাটায় ড্রাইভারের এলেম পরখ হয় নিত্যনিত্যি। এমন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে রাস্তা,—বর্ষাকালে এমন ধ্বস নামে ওপর থেকে,—যে ড্রাইভার খুব ঠাণ্ডা মাথা না হ'লে দুর্ঘটনা ঘটবেই। আর মেরামতির কাজ জানলে ড্রাইভারের কদর অনেক বেশী।

অম্বিকাবাবু বলাইকে বলেছিলো—সেখানে পাঞ্জাবী নেপালী ড্রাইভারের সঙ্গে আমার জোর কম্পিটিশান হবে। তুই থাকলে তবে আমি ভরসা পাই। চল বলাই কপাল ঠুকে দেখি।

এমন-ও বলেছিলো—লেখাপড়া করে দিচ্ছি। একখানা ট্যাক্সি তোর হবেখ'ন।

সে রাস্তায় একখানা ট্যাক্সির মালিক হওয়া মানে মাস গেলে কোন্ না পাঁচশো টাকা লাভ রাখা? মদনেশা করে বলাই টাকা ওড়াবে না, আর কাজে বেকাজে অম্বিকাবাবু কলকাতা এলে প'রে মেরে দেবেনা হকের টাকা সে বিশ্বাস অম্বিকাবাবু রাখতো। তাই তার টাঁক ছিল বলাইয়ের পরে।

কাঁচাপয়সা পাখা মেলে ওড়ে সে অঞ্চলে। চা-এর টাকা কাঁচা টাকা। তার গোণাগুন্‌তি নেই। জলপাইগুড়িতে যার চা-বাগান আছে সে কাঁচা টাকার ওপর দিয়ে হাঁটে। টাকার মায়া নেই ব'লে আশ্চর্য সব গল্প তৈরী করে সেখানকার মানুষ। দুই মক্কেল দর চড়িয়ে চড়িয়ে মাছের দর তুলে দেয় আট-দশ টাকা সেরে। মৌরলা মাছ বারো টাকা সেরে কিনলাম বলে গর্ব করে বাড়ী এসে। যাদের টাকা নেই তারা অবিশ্যি আঙ্গুল চুষে ঘরে ফেরে। কিন্তু তাদের ভরসায় তো অম্বিকাবাবু ব্যবসা করতে যায়নি। সেই সব মেজাজী মানুষ হাজার রকম দরকার অ-দরকারে যখন তখন গাড়ী চেয়ে বসে। যেমন তেমন দাম দেয় সেই সব খামখেয়ালীর। জলপাইগুড়ি দার্জিলিঙ দুশো-পাঁচশো যে কোন দামে রফা হতে পারে। আর সকল সময়, সকল সময় কেন, কোন সময়ই লেখাপড়ার কাজ চলে না।—বলছেন তো তিনশো?—নিশ্চয়। নিন না, রাখুন না দু'শো—এমনি ধারা ব্যাপার।

বিশ্বাসী মানুষ না হ'লে তো হকের টাকা মেরে দেবে। অম্বিকাবাবু এইসব কারণে চেয়েছিল বলাইকে।

কিন্তু তখন বলাইকে রুখেছিল সুধীর।—কোথায় যাবি? আমি ব্যবসা খুলছি, দেখনা কেন? কেন যাবি অতদূরে?

—তবু সুধীরদা, মাস গেলে ফেলে ছড়ে অতগুলো টাকা—

—আমি রইছি। ভাবিস কেন বলাই?

বলাই আর ভাবলো না। না করে দিয়ে এলো অম্বিকাবাবুকে।

অম্বিকাবাবু অগত্যা নিয়ে গেল রাখালকে। সেই রাখাল এখন জলপাইগুড়িতে দুখানা ট্যাক্সি করেছে। মোটা হাতে কামাচ্ছে।

সুধীর যে বলাইয়ের উন্নতির পথ মেরে দিল, সেজন্যে বলাই অবিশ্যি কোন কালেও দোষ দেয়নি সুধীরকে। তবে আজকাল বিজলীর কথায় ওঠা-বসা চলা-ফেরা করতে করতে সুধীরের যেন মনে হয় বলাইয়ের জন্যে তার আরো করা উচিত ছিল। কোথায় যেন মরাবিবেকের জ্যান্ত একটা টুকরো তাকে কামড়ায়। মনে হয় আর একটা মুখ। আর একটা মানুষের কথা। মনে পড়ে এমন সব দিনের কথা, যে দিনগুলোকে ঐ স্বার্থপর নোংরা মনের বিজলী আর তার স্নো মাখা ভাই কিছুতেই ধরতে ছুঁতে পারবে না। এ সব ভাবলে সুধীরের একটা আশ্চর্য জয়ের বোধ-ও হয়। হ্যাঁ বাবা। এখনকার সুধীর তোমাদের হাতের মানুষ। তোমরা তার টাকাটার দিকে দিবারাত্তির দেখছ, আর বাপের বাড়ীতে গিয়ে টাকাগুলো যে ভাবে পারো—ঢেলে দিয়ে আসছ। সুধীরের তরে তোমাদের মায়া মমতা কি আছে তা জানা আছে।

কিন্তু সুধীর এককালে অন্য মানুষ ছিল। সে-ও আনন্দে সুখ-শান্তিতে ছিল। তখন অবিশ্যি মাথার ওপর পাখা-ও ঘোরেনি—আর গরমকালের বিকেলে এমন জোড়াইলিশ কিনে ঘরে ফেরেনি সুধীর। তত পয়সা ছিল না। কিন্তু তখন সুধীর অনেক আনন্দে ছিল। মানুষের মতো মানুষ ছিল। এই ভেবে ভালো লাগে সুধীরের যে বিজলী তাকে যখন পেল, তখন অনেকাংশে খর্ব আর খারাপ একটা লোককে পেল। এইসব ভেবে সুধীরের একটা চোরা গর্ব হয়। বিজলীর ওপর যেন সে-ও একভাবে টেক্কা মেরেছে।

সুধীরের যে সব দিনের কথা মনে পড়ে—সে সব দিনে বলাই তার পাশে পাশে ছিল। মনে পড়ে কতদিন কাজ সেরে ফিরতে বেলা তিনটে বেজে গেছে, ভাত নিয়ে বসে থেকেছে শান্তিলতা। মনে পড়ে সে

ঠাণ্ডা ভাত খেতে পারেনা বলে কত রকম চেষ্টা করে শীতের রাত্রে গরম ভাত রাখতো শান্তিলতা। বলাই আর সুধীর খেতে এলো রাত এগারোটায়। শান্তিলতা বলতো

—তোমাদের কপালে নেই বাবু, তার আমি কি করবো। এমন করে চিংড়ি দিয়ে পোস্তচচ্চড়ি রাঁধলুম মোচার চপ ভাজলুম। এখন ঠাণ্ডা জিনিষ খাও।

বলাই আর সুধীর-ও জানতো এ হলো শান্তিলতার একটু ছেলেমানুষী চমকে দেবার চেষ্টা। তবু তারা জেনেশুনেই বলতো—কি আর হবে বল? কপালে যখন নেইকো!

তারপরে গরম ভাত, গরম ভাজা এনে সামনে বেড়ে দিয়ে চোখ ঠোঁট টিপে হাসতো শান্তিলতা, আর সুধীরও হাসতো।

ছোটখাটো ঘরোয়া সবজিনিষ নিয়ে শান্তিলতা কেমন হাসিখুসী থাকতো সে কথা সুধীরের খুব মনে পড়ে। আবার মনে পড়ে রিপেয়ার শপ একটা ছোটখাটো খোলবার কথা হচ্ছে। গায়ের গয়না কেমন বিনাপ্রতিবাদে খুলে দিচ্ছে শান্তিলতা। বলছে—ভালই হলো। ও অনন্ত আমার পছন্দ ছিল না বাবু। তুমি মন খারাপ ক'রোনা। আমাকে পরে নতুন ফ্যাসানের একজোড়া গড়িয়ে দিও।

বলাই সে সবদিনের সঙ্গে জড়ানো। তাই সুধীরের মনে হয় বলাই কথা কয়না, তবু যেন দোষ দেয় তাকে। দোষ দেয় বিজলীকে বিয়ে করবার জন্যে। দোষ দেয় ভেঙেচুরে ধন্দধরা পয়সা চেনা একটা অন্য সুধীর হয়ে যাবার জন্যে।

সুধীর বলাইকে ফেরাবে না! পুরোন সম্পর্ক, আর বলাইয়ের জীবনের যে বছরগুলো সে নিয়ে নিয়েছে, সে কথা ভেবে, সে দেবে চারহাজার টাকা।

সুধীর বলাইকে ট্যাক্সি কিনতে টাকা দিচ্ছে জেনে বিজলী আর তার মাসী অবিশ্যি উড়তে পুড়তে এসে পড়লো হাঁ হাঁ করে।

—সুবল একটা দুধপোষা ছেলে, তোমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে বাঁচছে। তার কথা একবার মনে হলোনি তোমার? তার সেই কবে থেকে একখানা ট্যাক্সির শখ? একখানা বেবিট্যাক্সি মুরোদ থাকে তো তাকে ক'রে দাও!

—মুরোদ থাকে তো তোমার ভাই বের করে আনুক না একখানা পারমিট!

বিজলী এবার পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো।—ওগো পারমিট যদি সে-ই আনবে, তবে তুমি তার একটা গার্জেন লোক হয়েছো কেন? সে যে তোমারই ভরসায় এয়েছে গো!

হঠাৎ করে রাগ চড়ে গেল সুধীরের। বললো—পরের গুড় পিঁপড়ের বেশী মিঠে লেগেছে তাই না? বয়াটে একটা বাঁদর বানাচ্ছো ভাইকে আবার কাঁদুনী গাইছ? যা ইচ্ছে করবো আমার পয়সা। বাড়ীতে ঝামেলা করোনি?

এমনি ধারা ফাটাফাটি অশান্তি হলো অনেক। কিন্তু শেষ অবধি টাকা দিলো সুধীর। উকীলবাড়ী থেকে চার ছ'লাইনের দলিল তৈরী হয়ে এলো। ষ্ট্যাম্প কাগজে সই করলো বলাই। বলাইয়ের দস্তখতী কাগজটা আলমারীতে তুললো বলাই।

বলাই একখানা পারমিট বের করেছে খবর পেয়ে অনেকেই এলো। জজবাড়ীর বড়ছেলে অমরবাবু পারমিটখানা কিনতে চাইলো তিন-হাজার টাকায়। বললো—দে ছেড়ে। তিনহাজার টাকা নিয়ে দোকান দে' ব্যবসা কর।

বলাই দু-দিকে মাথা নাড়লো। এ পারমিট কি সে অমনি ছেড়ে দিতে পারে? একখানা বেবিট্যাক্সি তার কতদিনের স্বপ্ন। তার মোটরমিস্তিরির জীবনে সে কি সম্মানটা পেতো বল? আজ ট্যাক্সি-মালিক ব'লে সবাই মানবে। বলাইয়ের দুটো পেটেল—সুধীরের

কারখানার দুই ছোকরা মালিক আর জ্ঞান বলাইকে ধস্তিধস্তি করলো। বললো—

—হ্যাঁ, ব্যাটাছেলের মতো কাজ করলো বটে বলাইদা। এখন নিজের ট্যাক্সি নে' পোঁ ক'রে হর্ণ বাজিয়ে চলে যাবে সকলকার নাকের পর দে'!

—দেখে জ্বলে পুড়ে মরবে খ'ন ঐ সুবল! দেখে নিও খ'ন বলাইদা।

আজ বলাই কারুকথা-ই শুনলো না। বললো—যা যা মানুষকে অমন ভাবিস্নি। জানিস্নাতো সুধীরদা আমার যে উপকার করলো! তবে হ্যাঁ, এখন সুধীরদাকেও ট্যাক্সিমালিক ব'লে সম্মান করে' কথা কইতে হবে! হ্যাঁ বাবু। আর মিস্তিরি বলে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে নি।

হন্তদন্ত হয়ে সুধীরই এলো। বলাই সুধীরকে আজ মস্ত খাতির করলো। বললো—চল সুধীরদা খাওয়াই তোমাকে।

রূপালী সিনেমার পাশের খুপরি চা খানায় বসে সুধীর ভেজিটেব্‌ল চপ আর ডবলডিমের অমলেটে তেলতেলে পেতলের চামচে ছোঁয়াল না। বললো,

—হ্যাঁ বলাই, যে কথা শুধোতে এলুম সেই কথা ক। তুই নাকি কারখানায় যাবি না বলিছিস? বলিছিস কাজ করবিনি? ঘণ্টা দু'য়েক ক'রে যাবিতো?

—নিশ্চয় সুধীরদা! নয়তো ভোর থেকে ট্যাক্সিনে' বেরিয়ে পড়বো নাকি ভাবছো?

বললো বটে, কিন্তু কথা কইতে কইতে বলাই আজ হাসিমুখে চেয়ে রইলো রাস্তারদিকে। সন্ধ্যাবেলায় সিনেমা 'শো' ভেঙেছে। অফিসেরও ছুটির সময়। এই সময় বলাইয়ের আজন্ম কালের পরিচিত রসারোডের এই টুকরোটা কেমন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। আজকে এই

নিত্যকার দেখা রাস্তাটুকুই বলাইয়ের আরো ভাল লাগে। রূপালীর সামনে ডিমের দম মেটেচচ্চড়ি আর মাংসের ঘুগনি সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। ডিবরি-র আলোয় কেমন ধোঁয়া হচ্ছে। ওই ওপারে বাটার দোকান কেমন আলোয় সাজিয়েছে। রাস্তায় কত জিনিষ ঢাল দিয়ে বসেছে। এই ফুটপাথ থেকেই তো বিয়ের বাজার হয়ে যায়। ভোমরা মিথ্যে বলে না। আর কি সাড়ে ছ-আনার দিনই যে পড়েছে। সাড়ে ছ-আনা ফেললে খেলনাপাতি থেকে সুরু করে ছোট তোয়ালে, গেঞ্জী, হাত আয়না, পেতলের হাতা চামচে, ছাঁকনী, চালন, দাড়ি কামাবার বুরুশ, প্ল্যাষ্টিকের বেলকুঁড়ির মালা, কাঁচের কানফুল। এক টাকা চার আনার নীলাম হেঁকে গলা ফাটাচ্ছে যারা তারা গামছা, ব্লাউজ এমন কি ছিটের সার্ট-ও নিয়ে বসেছে। আর্যট্রাঙ্ক ফ্যাকটরী আর রাজবন্দীর ট্রাঙ্কের দোকান ডানহাতে রেখে পুরোন ঘোড়াগাড়ীর আড্ডায় নতুন দিনে হকার্স কর্নার। সামনে লুঙ্গি গামছা, ভিতরে যা চাও তাই পাবে। পেছনে এমন কি হাতবদলী আসবাবপত্তর-ও পাওয়া যায়।

কেমন সজীব পরিবেশ। আর এই সবের মধ্যে ঐ যে কর্মব্যস্ত ভাবে বেবিট্যাক্সিগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে, বলাই সগর্বে ভাবে—শীগগির-ই সেখানে নতুন একটা ট্যাক্সি দেখা যাবে।

সুধীর আবার বলে—আমার কারখানাকে লেঙ্গি মারিসনি বাবু। ড্রাইভারী শেখাবার ইস্কুলটা খুলবো, এই তো কাজের সময়। তুই চট করে এখনই ফেঁসে গেলি !

—তা কতবড় একটা উন্নতি, বল দিখি ?

বলাইয়ের কথাটা শুনে চোখ টেরছা করে তাকায় সুধীর। উন্নতি যে হবে তা কি জানে না সুধীর ? বলে

—তা তুই ছালা বেঁধে পয়সা ঘরে তোল্ গে যা। আমি কিছু কব না। তবে আমারেও দেখিস্ একটু। একেবারে ভাসিয়ে দিস না।

—সুধীর দা, বলাই নেমোখারাম নয় কো। এই-টি মনে রাখবে।

সুধীর ওঠবার সময়ে বললো—বলাই, একবারটি বাসায় যাস্ তো। ডেকেছে তোকে।

এই সময় সুধীরকে পুরোন দিনের মতো ভাললাগে বলাইয়ের। বলতে ইচ্ছে করে, দাদা গো তুমি যারে বিশ্বাস করে ঘরে তুলেছ শাঁখা-সিঁদুর দে'—সে এক সর্বনেশে মেয়ে। ঘর-সংসারে তার মন নেই। এই যে, তুমি এখন ফের গিয়ে কারখানা বন্দছন্দ করে দোরের কাছে তালার মুখে কাগজে আগুন জ্বেলে বিশ্বকর্মার দোহাই মেনে রাত এগারোটায় বাসায় ফিরবে, তুমি কি বৌয়ের খবর রাখ? তুমি কি জান, যে বিজলী আমারে কতদিন কুভাবে ডেকেছে। তুমি কি জান, যে জ্ঞান তোমার বাড়ীর দিক মাড়ায় না ঐ মেয়েটির জন্য? আর গত দেড়মাস যাবৎ যা চলেছে। কাল রাত সাড়ে নটায় আমি স্বচক্ষে দেখনু পুর্ণথেটার থেকে বেরুচ্ছে তোমার বৌ ঐ বজ্জাত রমনবাবুর সঙ্গে? তুমি সাবধান হও।

কিন্তু কিছুই বলতে পারে না বলাই। বলে—যাবথ'ন। সময় করে। বলতে হবে কেন? এমনিই যাব।

সুধীর চলে গেলে-ও আজ আর ঘরে ফিরতে পারে না বলাই। গিয়ে বসে নর্দার্ন পার্কে। কত কথাই যে ভাবে বলাই। তার গাড়ীখানা হবে হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থান সে কমকরে পঞ্চাশখানা মেরামত করেছে কারখানায়। হিন্দুস্থান গাড়ীর নাড়ীনক্ষত্র তার জানা। পরের গাড়ী সেরেছে আর সেধে সেধে ভাল কথা কইতে গিয়ে মক্কেলের মুখে চড়া কথা শুনেছে। গাড়ীর যাতে ভাল হয়, সে জন্যে-ই সে বলেছে—সার এই চোটে যদি রংটা করিয়ে নিতেন। ও গীয়ার-ও না পালটালে হবে না কো।

মক্কেল বলেছে—তোমার ফড়কাবার দরকার কি বাবু?

সত্যি মক্কেল যে কতরকম হয়! মোটরমিস্তিরিকে সম্মান করে কথা কইতে বাবুদের যেন মাথাকাটা যায়। গ্যারেজে গাড়ী দিতে এসে যে

ভদ্রলোক ভাই বলে কথা কইবেন, তিনিই তাঁর বাড়ীতে টাকার তাগাদায় গেলে ঘরে ডেকে বসতে অবধি বলবেন না। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দেবেন। বসলে পরে বারবার তাকাবেন, দেখবেন মেকানিকের জামাপ্যান্টের তেলকালীতে তাঁর আসবাব নোংরা হলো কিনা। এক এক সময় কি বলাইয়ের মনে হয়নি যে ঝট্ করে চাকরি নেয় সরকারী ওয়ার্কশপে? কিন্তু সে পথে কাঁটা। লেখাপড়া জানা মেকানিক তো নয়, যে দেড়শে দুশো টাকা মাইনের চাকরী পাবে ঝট করে।

এমনিতে সুধীরদা তাকে চোখে হারায়। বলাই আসেনি কেন? বলাইয়ের কি অসুখ করেছে? বলাই কি আগাম টাকা চায়? কত কথা বলাইকে নিয়ে। কিন্তু বলাই জানে তার জীবনে নিরাপত্তা কত কম। ময়নার হাসিখুশী মুখখানা বলাইয়ের আজও যেন চোখের সামনে ভাসে। গরীব এক স্কুল মাষ্টারের ছেলে ময়না। লেখাপড়া হবেনা জেনে হাসিমুখেই বলাইয়ের সাগ্‌রেদী করতে এসেছিল। কেমন ছলবলে ছেলেটা। হাতে কাচা ফর্সা জামা পরে এসে ডাকতো—বলাইদা। আটটা বেজে গেল।

সেদিন কারখানায় ওয়েল্‌ডিং-এর কাজ হচ্ছিলো। বলাই ঠিক সেই সময়টা সামনে ছিলো না। দুঘটনাটা যে কেমন করে ঘটলো। আজও বলাই না ভেবে পারে না, যে সে সামনে থাকলে অমন কাণ্ডটা ঘটতো না। পেট্রলে লাগলো আগুন, আর ময়নাকে সবাই দেখলো ছুটে ইয়ার্ডে চলে আসতে। যত চেঁচায় সুধীর, ছুটিস্‌না—ময়না, ছুটিস্‌না আগুন ছড়িয়ে যাবে—ওকে মাটিতে ফেলে দে তোরা। ততই ছোটে ময়না। ছোটে আর অদ্ভুত একটা শিরশিরে চীৎকার করে। মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে না আসা অবধি আগুন নিভলো না বটে, কিন্তু অনিষ্ট যা হবার ততক্ষণে হয়ে গিয়েছে।

আর পাঁচকড়ি? গাড়ীর নিচে শুয়ে পরিষ্কার করছে, সুবলেরই দোষে হঠাৎ করে গাড়ী ষ্টার্ট নিয়ে ছেলেটার একখানা হাত একেবারে

জখম হয়ে গেল। কনুই থেকে কাটা, পাঁচকড়িকে আজও দেখা যায়—পথে পথে বেলুন ফিরি করতে।

বলাই কি তাদের কথা জানে না? বলাই জানে তার, ময়নার, বা পাঁচকড়ির মতো মেকানিকের জীবনে কোন ক্ষতিপূরণ থাকতে পারেনা।

এই সব হাজারটা নিরাপত্তার অভাব বলাই নিরন্তর অনুভব করেছে। বৌ-এর নির্ভরশীল চাহনি আর বাচ্ছাদুটোর মুখ তাকে তাগিদ দিয়েছে। মায়ের রেখাঙ্কিত বাদামীমুখ, আর অভাবের সংসারে জোড়াতালি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা তার মনে দাগ কেটেছে। এদের ত'রে একটা কিছু করতে পারলে তার ভাল লাগবে।

হয়তো বেবিট্যাক্সিটা তাকে এনে দেবে সেই নিরাপত্তা। সে নিরাপত্তা পাকা কোঠায় গডরেজের আলমারীতে বাস করে। এদের ছেলের সঙ্গে ওদের মেয়ের বিয়েতে নগদ, গহনা আর আসবাবের সঙ্গে যে নিরাপত্তা বাসাবদল ক'রে অন্যসিন্ধুকে গিয়ে ওঠে। যে নিরাপত্তা বলাইয়ের মতো মেকানিকের জীবনে কোনদিনও থাকতে পারেনা।

॥ পাঁচ ॥

গাড়ীখানা হাতে পাবার আগে অনেকগুলো ঝামেলার ব্যাপার আছে। হায়ার পারচেজ সিষ্টেমে গাড়ী কিনেছে বলাই। চব্বিশ-ভাগে আড়াই হাজার টাকা তাকে মিটিয়ে দিতে হবে। মিটার লাইসেন্স আরো ঐ রকম সতেরো ঝামেলা রয়েছে। সব হাঙ্গামা মিটিয়ে যখন হাতে এলো গাড়ী, তখন প্রথমেই গাড়ীখানার মিটার লালশালুতে মুড়িয়ে নিয়ে বলাই গাড়ীটা চালিয়ে দিলো কালীঘাট ট্রামডিপোর উল্‌টো রাস্তা-টা ধরে। বাড়ীতে কারুকে বলেনি। কিন্তু মায়ের কাছে মানসিক করে রেখেছিলো। মনে মনে বলেছিলো—মা গো। যদি দয়া ক'রে দাও একখানা ট্যাকসি গাড়ী বলাই-রে তবে তোমারেআমি সওয়া টাকার ডালা দেবো। অবস্থা ফিইরে দাও দিখিনি মা—ঐ হতভাগা গুলোর মতো শেতলা পুজো (মা শেতলা, মাপ ক'রো মা!) না ক'রে তোমারে আমি পাঁঠা দে' পুজো দেবো।

আজ সেদিন এসেছে। আজ বলাই গঙ্গায় নাইলো। সওয়া টাকার ডালা সাজিয়ে নিয়ে পুজো দিল মন্দিরে। কারা যেন মস্তো পুজো দিতে এসেছে। এক তাড়া ফিল্ম মায়ের পায়ে চড়াচ্ছে—বসে আছে একজন ভক্তিভরে ফোঁটা কেটে। গরদের কাপড়, সোনার নথ—কত কি সাজানো নতুন কাঁসার থালে। নিজের পুজো হাতে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখে বলাই। ওরে-ই বলে মহরৎ করা। মায়ের প্রেসাদী ফিল্ম নিয়ে সিনেমা করবে। তখন ঝ্যানো মা ঢেলে দেয় টাকা। দেখতে দেখতে দেরী হয়ে যেতে চায়। সম্বিৎ ফিরে বলাই গম্ভীর হয়ে বলে।

—হালদার ঠাকুর—আমাদের-ও কাজ গো। আমাদেরকেও এট্টু, দেবেন তাড়াতাড়ি করে।

—নিশ্চয়! মায়ের কাছে সকল ছেলেই সমান গো!

বলাইয়ের হাতে প্রসাদী ফুল সন্দেশ ধরিয়ে দেয় হালদারমশাই।

রাস্তার মানুষ জানছে না—কিন্তু ভবানীপুরের সেই রাস্তায়, সেই বাড়ীটিতে আজ উৎসব পড়েছে। সেই কোন্ ভোরে নিজে নেয়ে, ছেলেদের নাইয়ে, ভাল কাপড় পরে বসে আছে ভোমরা। সাত সকালে জল ধরে ঘরদোর সাফ করেছে। মাছ চচ্চড়ি, মাছের অম্বল, আর ভাত রেঁধে খাটের তলে ফর্সা ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ঘরের সকল কাজ সারা—কিন্তু বলাই আসে কই?

শাশুড়ীকে বলেনি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে পান আনিয়েছে। বাটা ভরা পান সেজে রেকাবী চাপা দিয়েছে। কুঁজোকলসীতে ঠাণ্ডা খাবার জল ভরেছে। কাঁসার গেলাস সোনার মতো করে ঘষেছে। ভোমরা-র ভারী সুনাম পাড়াতে—ভোমরা-র মতো কাজের বৌ নেই। অন্য মিস্তিরীদের ঘরে দেখ গিয়ে। নিত্যি ঝগড়া—পুরুষে মদ খেয়ে আসছে। মেয়েরা চেঁচাচ্ছে—বৌ-পেটানো চলেছে। মেয়ে বৌ সন্ধ্যে হলে ফুটপাথে খাটিয়া পেতে বসে যায়। ঘরের কাজকর্ম যেন নেই। এমনি ভাবে-ই গা ছেড়ে গল্প গুজব করে।

ভোমরা-র চেহারাটি আঁটসাট—বেঁধে সংসার করে ভোমরা। পাড়ার ঝি বৌ-দের সঙ্গে গা ঢালিয়ে গল্প করে না। ভোরে পিঁপড়ের মতো পেছনদিক উঁচিয়ে কোমরে কাপড় বেঁধে ছুটোছুটি করে কাজ করে। ভোমরা-র ছেলেরা দুপুরে ঘুমোয়। ভোমরা কুরুসকাঁটায় ছেলের গেঞ্জী বোনে। সামনের বাড়ীর ক্রীশ্চানদের বুড়ী রিফু-আর সূতোর কাজে ভারী পাকা। ভোমরা তার কাছে মাছের কাঁটা ফোঁড় শিখে টেবিল ঢাকনী করে। ঘর খানা ঝেড়ে পুঁছে ঝকঝকে করে। আজকের দিনে কি ভোমরা অমন চুপ করে

থাকতে পারে ? সকল কাজ সেরে সতরঞ্চি মাদুর পাটি এ'নে পাতে ঘরে, রোয়াকে। শাশুড়ী-কে বলে—তুমি বাবু তাতে বেরিওনি। এই ছাঁওয়ায় বসো দিখিনি নাতি কোলে নে ?

আবার একপাক ঘুরে এসে বলে—অমন একভাবে বসে রয়েছ কেন মা ?

বলে—শ্বশুর ঠাকুরের একখানাও ছবি নেই কেন গা ?

—কেন, বৌ।

—বেশ ঝেড়ে পুঁছে চন্দন দে' হরিনাম লিখে দিতুম।

তার শহুরে বৌ কত কথা ভাবে।

বুড়ী অবাক হয়ে বলে—ঝানিনি লো অতশত। ঝানলে নয় একখানা ছবি তুলে রাখতুম।

ভদ্দর ঘরে এমন রাখে-ই।

এমনি সময়-ই শাঁখ বাজিয়ে উঠলো মিশিরের বৌ। ছুটে এলো ভোমরা। এসে গেছে গাড়ী।

বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে আজ বলাই গাড়ী থেকে নামছেনা। তার আজন্মকালের পরিচিত মানুষরা সব ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। নামবে কেমন করে বলাই। ভীড় ছাপিয়ে চোখ ট্যারছা করে দেখে, ঐ যে ভোমরা এসে চাকার গোড়ায় জল ঢালছে। গাড়ী থেকে নামে বলাই, গলায় গাঁদাফুলের মালা, কপালে সিঁদুর ফোঁটা আর ঠোঙা হাতে। সবাই সপ্রশংস চোখে গাড়ীটাকে আর বলাইকে অভিনন্দিত করে। কিরপালসিঙের ছেলে মহিন্দর সিং আজ বলাইকে ভীড়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে চওড়া পাঞ্জায় পিঠ চাপড়ে অভিনন্দিত করে। বলে...

—হাঁ, ছেলের মতো ছেলে বটে ভাই। পুরুষ বাচ্ছা। এই বাজারে একখানা ছোট ট্যাক্সি এনে হাজির করলে।

ভোমরা-র সাধের পঞ্চীদিদি, অন্যদিন যে ভোমরাকে কথায় কথায় হাতের তাগা, গলার হার আর কোমরের বিছে দেখিয়ে মনে হিংসে জাগায়,

সে আজ সকলের মধ্যে ভোমরাকে শুনিয়ে বললো—আর কি ক্যাটালগ দেখে মন ভরাতে হবেনা লো। দেখিস গয়নায় তোর গা ভ'রে দেবে খ'ন কারিগর।

সকলে আনন্দ করছে। শুধু আনন্দে হাসতে গিয়ে কেঁদে উঠলো বলাইয়ের মা, নিতাইচাঁদের বৌ। কেঁদে উঠলো নিতাইচাঁদের নাম ধরে। ওগো! তুমি কোথায় গেলে গো। সারাজীবন কত কষ্ট করে গেলে—ভাল খাবার খেলে না ভাল বিছানায় শুলে না—বলাইরে নিয়ে তোমার যে মনে কত চিন্তা ছিল গো! আজ সেই বলাই তোমার কত গৈরবের কাজ করেছে গো। তুমি একবার দেখলে না।

আর আজ বলাই তার মা-কে সান্ত্বনা দিল! মিশিরের বৌ আর পঞ্চী বললো—কেঁদনি গো। এমন শুভদিনে কাঁদতে নেই কো!

গরীবঘরে কান্নাকাটি বেশীক্ষণ সয় না। তারপর সামলে গেল নিতাইচাঁদের বিধবা।

মায়ের সামনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলাই বৌ-য়ের হাতে গলার মালা আর প্রসাদের চুপড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো। ভোমরাকে বললো—ঝানারা এয়েছেন, তাঁদের পান-জল দে—কথা ক'। আমি চললুম।

—কোথায় গো।

—বেরোবনি? গাড়ী বইসে রাখব?

তাই-তো। নবলব্ধ গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে বলাই যেন কেমন কাজের মানুষ হয়ে গিয়েছে। চেয়ে দেখে ভোমরা। তারপর ভয়ে ভয়ে বলে—

—দুটো খেয়ে গেলে হতোনি? সেই কখন ফিরবে?

—ট্যাকসি নিইছি—এখন নাবার খাবার কথা ভুলে ঝেতে হবে রে ভোমরা। শরীরের মায়া করলে পরে পয়সা হবে না কো!

—তা মিষ্টি মুখে দে যাও।

—মিষ্টি? কোথা খে এলো?

ভোমরা বলে—এনিছি।

পাশের খুপরি ঘরে নিয়ে বলাইকে ভোমরা ঝকঝকে কাঁসার রেকাবীতে চট করে দু-টুকরো পাকা-পেঁপে দুটো দানাদার খেতে দেয়। বলে—বাজার থে কাঁচা পেঁপে আনলে, তা দেখি পেকে উঠেছে। তা ভাবলুম, ভালই হলো। মা মুখে দে' জল খাবেখ'ন আর সেই বোতল বেচা পয়সা। তাই দে মিষ্টি এ নছি।

—কোন্ বোতল রে?

—ঝানো না? ন্যাকা যেন? ভাঙা বাক্সে রেখেছে আমি দেখিনি বুঝি?

—তুই নিলি কেন?

—আমার হক্ না? প'স্কের কারে রাখে কে? আমিই তো।

যে বৌ এমন সেবাযত্ন করে, তাকে বোধ হয় একটু আদর করা উচিত। বলাই কিন্তু সন্দেহের চোখে চায়। বলে—কি মেখিছিস্? বড় যে খুশ্‌বো বেরুচ্ছে?

—কান্তা সেণ্ট।

—তাই ঝ্যানো অন্যরকম মনে হচ্ছে।

—কি ভেমো মানুষ গো। নেয়ে ধুয়ে একটা শুভদিন। একটু দিইছি না হয়।

জল খেয়ে আর চট্ করে বৌয়ের মাথায় হাত সাপটে গাড়ীতে উঠে পড়ে বলাই। আর চট করে একটু ধূলো উড়িয়ে চলে যায় W. B. T. সেভেন্ ওয়ান, ও, ও, নিরুদ্দেশ হয়ে যায় মিঠাইয়ের দোকানের বাঁকে।

দ্বারিক ঘোষের দোকানের সামনের ষ্ট্যাণ্ডে আজ আর একখানা ট্যাক্সি বেড়েছে। তাকিয়ে দেখছে ট্যাক্সিচালক-রা! হয়তো, সে দৃষ্টিতে একটু অসূয়ার ভাব আছে! এই বাজারে প্রতিযোগী বাড়লে কার ভালো লাগে? কিন্তু সে অসূয়া আজ আর স্পর্শ করতে পারে না বলাইকে! এই মস্ত রাস্তাখানায়, আজ—সে নিজের একখানা ট্যাক্সির জোরে অধিকার

কায়েম করেছে! মনটা এখন চমৎকার লাগে, যে এখন বলাইয়ের বিজলীর ওপরে-ও রাগ হয় না। মনে হয় যাবে খ'ন আজ! যাবে একবার। ট্যাক্সিটা বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে। ওপরে গিয়ে বিজলীর সঙ্গে সহজ ভাবেই কথা কইবে। বলবে—দেখি বৌদি এক গেলাস জল দেখি। তারপর কবে বেড়াতে যাবেন বলুন? নতুন গাড়ী করলাম, আপনাকে একদিন যেতেই হবে।

অফিস-টাইমে বেবিট্যাক্সি দাঁড়াতে পায় না কি? ছুটে দুই মাদ্রাজী ভদ্রলোক এসে উঠলেন গাড়ীতে। বললেন—ডালহৌসী!

গাড়ীটা যেন বলাইয়ের এতটুকু-ইসারার জন্যে বসেছিলো। এখন অমনি উড়ে চললো যান্ত্রিক ছন্দে। কলকাতা সহরটা যে কত সুন্দর—কত-যে রূপ তার, আগে কোনদিন দেখেনি বলাই। এই এলগিন রোডের মোড়। এককালে এসব জায়গায় কি শোভা ছিলো। তখন সব সায়েব সুবো-রা ছিল শহরে। শুধু যে সায়েবদের জন্যে তাও-তো নয়। তখন যেন কেন, এই সহরটা অনেক বেশী পরিষ্কার থাকতো। খুব ঝকঝকে, খুব পরিষ্কার। এই এলগিন রোডের মোড়, এদিকে ওদিকে কত নিরিবিলি ছিল। গাড়ী বাঁদিকে ঘুরিয়ে দেয় বলাই। হরিশমুখার্জি ধরে বেরিয়ে পড়বে। এমন সুন্দর ছন্দরেখে চলেছে গাড়ীটা, কোথাও একটু-বেয়াড়া শব্দ হচ্ছে না, বা তাল কাটছে না কোন বে-খাপ্পা ব্যবহারে। হরিশমুখার্জি রোডে ঢুকতে না ঢুকতে বড়-বড় দেবদারু গুলমোর আর কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁক দিয়ে হাঁসপাতালের সুবিশাল লাল বাড়ীটা চোখে পড়ে বাঁ হাতি। কেমন আভিজাত্যপূর্ণ—একটু আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ডানহাতি গোখেল স্কুলের শাদা বাড়ীর থামগুলো যেন কত বছর ধরে এক কর্ত্তব্যের গুরুভার নীরবে বহন করে চলেছে। হলেই বা সকাল। এখনি কাজের তাড়াহুড়ো পড়ে গিয়েছে। রাস্তাটাকে পেছনে রেখে, এসে পড়ে বলাই ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল রোডে।

ময়দান। ময়দান। কলকাতার বুকে নিঃশ্বাস ফেলবার মতো এই একটা জায়গাই রয়েছে। সারা শহরটা-ই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারে এখানে এসে। সন্ধ্যেবেলা, যখন এর উত্তর-পুব প্রান্ত দিয়ে আলোর মালা সেজে ওঠে—তখন ময়দানের অন্ধকার বুকে অনেক শরণার্থী-র ভীড়। এখন সকাল বেলা অবশ্য ময়দানের অন্য-চেহারা। গাছগুলো সকালের বাতাসে পাতা ঝিলমিল করছে। সবুজ এই সুন্দর শ্যামলিমা-র বুকে এখানে সেখানে দেখা যায় কয়েকটা গরু চরতে। মানুষ যে দেখা যায় না তা নয়। কোন গাছের তলায় মাথার নিচে হাত রেখে পড়ে আছে কেউ। কোথাও বা দু'চারজন বসে আছে। আর ঐ যে একটি সুন্দর মেয়ে আর দুটি ছেলে বসে কি করছে? ছবি আঁকছে ওরা? সকাল-বেলার-ময়দানে দেখা যায় যাদের—তারা প্রায়-ই বেকার, চাকরীহীন, বা কোন না কোন রকমে হেরে যাওয়া মানুষ। বলাই তা জানে।

রেডরোড ধরে গাড়ীটা এবার গর্বিত-ভাবে এগিয়ে চলে। কি একখানা রাস্তা? আর লাটসায়েবের বাড়ীটা-ই কি চমৎকার। সুধীরের কারখানার গাড়ী নিয়ে এখানে সেখানে কম যায়নি বলাই। আর ডালহৌসী-ও সে কমবার আসেনি। এই আকাশছোঁয়া বড়বড় বাড়ী আর নিষ্প্রাণ রাস্তা গুলো-যে কত প্রাণবন্ত, কত সুন্দর, তা আগে কোনদিন জানেনি বলাই। আজ যেন সে বুঝতে পারছে। আবার একথা-ও সত্যি, যে নিজের মনের ছোঁয়া-টা অমন ক'রে লেগেছে বলে-ই সব কিছু ভাল লাগছে তার। দুই ভদ্রলোক নেমে যান কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের মোড়ের বিশাল রেল-ওয়ের বাড়ীটাতে। প্রথম বউনীর পয়সা মাথায় ঠেকিয়ে বলাই বুকের কাছে হাতড়ায়। স্বামী পয়সা আনবে ছালা বেঁধে—এই বিশ্বাস ভোমরা-র। তাই রাত্রি জেগে কোরা-মার্কিণের কাপড় দিয়ে হাতে ফোঁড়ানো বখেয়া সেলাইয়ে থলি বানিয়েছে ভোমরা। বুকের কাছে সার্টের নীচে গেঞ্জীর সঙ্গে সেই থলি সেফ্‌টিপিনে আঁট-কানো। সেই গেঞ্জির তলাটা আবার পাজামার ভেতর ঢোকানো

শক্ত-করে কসি দিয়ে বাঁধা। নানারকম ভয় ভোমরা-র। যদি বা টাকাপয়সা থলিতে সাবধান হলো—তবু, ঝট ক'রে উঠতে গিয়ে যে সেই টাকা পড়ে যাবে না, তা' কে জানে?

—তুমি বাবু ভ্যায়নক অসাবধানী মানুষ—তোমাকে বাবু বিশ্বাস নেই।

—হ্যাঁ, বলাইচাঁদ দাসের হাতের থেকে হকের টাকা ছিনিয়ে নেবে, তেমন মরদ জানবি এ তল্লাটে জন্মেনি কো।

—তোমার শুধু বাবু লম্বা কথা। ঐ জোয়ান, বাঘের মতো পুরুষ মহেন্দর সিং—তার পকেট থেকে নেয়নি?

—আরে, নিইছিল তার-ই বৌ-এর সোদর-ভাই সুমুন্দী আর তখন সিং বেহুঁস ছিল নেশায়।

—ঝানিনি বাবু ঝা ভাল হয় কোর।

এখন বলাই দেখে, যা-ই-বলুক ভোমরা-সেই থলি বের করে পয়সা রাখা কোনরকমে সম্ভব নয়। বারবার ভাড়ানেবে, আর অমনি করে রাখবে নাকি? থলিটা বের করে ভাড়ার পয়সা তাতে ফেলে, সেই থলির ওপর চেপে বসে বলাই। এতক্ষণে যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। রেলওয়ে আপিসের গায়ে কেমন সব পোস্টার। 'আগ্রা দেখুন' 'তাজমহল দেখুন'। সুন্দর ছবির গায়ে পানের পিচ ফেলে বিশ্রী ব্যাপার করেছে। তাজমহল বলাই দেখেছে বটে একটা হিন্দী সিনেমায়। বেশ রঙীন ছবি। তাজমহলের উপর চাঁদ উঠেছে আর বাদশা-বেগম হাত ধরাধরি করে চলেছে। সেই গানটা মনে পড়লো বলাইয়ের। ইস্কুল পালিয়ে ঐ ময়নার দাদা বংশী কেমন নেচে দেখাতো বলাইদের বাড়ীতে এসে। বলাইয়ের মা বলতো

—হাসি ঠাট্টা বটুকেরা বাবু আমি বড্ড ভালবাসি। নাচ্ তো বাবা বংশী।

বংশী কোমরে হাত দিয়ে আরদালা সেজে নাচতো

—আয় বিবি তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখিছি

—আমি বাদশা হইছি—

—আমি বেগম হইছি—

—মোরা বাদশা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্‌ বাজিয়ে চলিছি ॥

বলাই ভাবতো খোয়াব মানে বুঝি খোয়া ক্ষীরের মতো কিছু একটা। পরে জানলো, খোয়াব মানে স্বপ্ন। তারই কারিগরী-জীবনের বন্ধু হারুণ তাকে পড়িয়ে শুনিয়েছে—বাদশাবেগমের কিচ্ছা। আর তাতেই জানতে পেরেছে খোয়াব মানে স্বপ্ন।

এবার আরোহী হলো এক অবাঙালী শেঠ। গাড়ী গেল বড়বাজার। বড়বাজারে ঘুরে ঘুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে পৌঁছিয়ে মিটারটা কাগজে মুড়িয়ে চা খাবার নিয়ে বসলো বলাই দরজা খুলে, পা ছড়িয়ে। হঠাৎ সামনের বাড়ী থেকে প্রায় ছুটে নেমে এলো ছিপছিপে সুন্দর চেহারার স্বামী স্ত্রী। প্যাসেঞ্জার দেখেই মন খুশী বলাইয়ের। ষ্ট্যাণ্ডে অনেক ট্যাক্সি রয়েছে। সব থাকতে কেমন তারই ট্যাক্সি এসে ধরলো। মেয়েটির যেমন চেহারা, তেমনি সাজগোজ। বলাইয়ের বুদ্ধিতে বলাই ভাবে নিশ্চয় কোন অফিসার মানুষ হবে। অফিসার সম্পর্কে বলাইয়ের খুব ধারণা নেই। অফিসার কারা কে জানে। অফিসার-রা ভাল সাদা প্যাণ্ট পরে অফিসে যায় আর তাদের বৌ-রা দুপুর বেলা ঠোঁটে রং দিয়ে বেড়াতে যায়।

এই মেয়েটি চমৎকার জীবন্ত। চোখ নাচছে, ঠোঁট হাসছে। কালোচুল ঝাপটাচ্ছে, নতুন বিয়ের ছাপ নতুন কাপড়ে আর চোখমুখের খুশীতে। ট্যাকসিতে উঠে ছেলেটিকে বললো

—আগে দিদির বাড়ী।

—বালিগঞ্জ।

ছেলেটী ঝুঁকে পড়ে বললো। তারপর গাড়ীর ভেতরে টুকরো টুকরো হাসি আর কথার ফোয়ারা ছুটলো। মেয়েটি বললো

—যা ভয় পেয়েছিলাম বাব্বা, তোমার সেজপিসিমা যখন বললেন বৌমাকে যেতে হবে না। ভেবেছিলাম যাওয়াটা ভেস্তে গেল বুঝি।

—এখন কেমন লাগছে ?

—চমৎকার।

—আমার কি মনে হচ্ছে জানো ?

—কি ?

—মনে হচ্ছে, আর যেন না ফিরি। চলে যাই সেই বরানগর। যাবে ঊর্মি ?

—উঁ ?

—ঊর্মি ? যাবে ?

—ফিরতে হবে না।

—কেন, বিয়ের আগের কথা মনে নেই ?

—কি মনে করবো ?

—সেই প্রথম দেখা, বল না ঊর্মি ? মনে পড়ে ?

—মা গো, অমনি করে নাকি দু'জনে আলাপ করে ? মুখোমুখি ব'সে শুধু ঘামছি। এমন রাগ হচ্ছে ?

—কার ওপর ?

—তোমার ওপর। তুমিও একটা কথাও বলছ না।

—তারপর ?

—তারপর আবার কি। আলাপ হতেই কি। আমাকে মেট্রোর সামনে দাঁড় করিয়ে সেদিন সরে পড়েছিল কেন বল তো ?

—বাঃ, সামনে কে ছিল জান না ? হঠাৎ দেখি রাঙাকাকা !

—যাই বল, তুমি বাপু বড্ড লাজুক। অমন লাজুক হলে চলে ?

—আর তুমি কি ? বিয়ের আগে এত পালিয়ে পালিয়ে দেখা করা —ফুলশয্যার রাতে সে কি ন্যাকামি। যেন নতুন পরিচয়।

—ও, আমি ন্যাকা ?

—নিশ্চয়।

—বেশ।

—আচ্ছা, ফিরিয়ে নিচ্ছি কথা।

—ঠিক আছে, আমাকে নামিয়ে দাও দিদির বাড়ীতে। তুমি একলাই যাও নেমন্তন্ন করতে।

—অমনি রাগ হলো।

—হবেই তো।

—ঠিক আছে, আমি ক্ষমা চাচ্ছি হলো তো?

ইচ্ছে ক'রে হর্ণ দিতে থাকে বলাই। কান মাথা তার গরম হয়ে উঠেছে। ছেলেটি নিচু গলায় বলে—

—ট্যাক্সি ড্রাইভারটা কি ভাবছে জান ত'?

—কি ভাববে আবার। ভাবছে তুমি ভারী নির্লজ্জ।

—আর তোমাকে?

এবার দুজনেই হাসতে থাকে। মেয়েটি বলে—কবে আমরা পুরী যাচ্ছি বল তো? পুরী না গেলে কিন্তু ভাল লাগছে না। এখানে যা বৌ হয়ে হয়ে থাকতে হচ্ছে!

—পুরীতেও দিদি আছেন।

—চেনা লোক ত।

আবার হাসি। সবুজ নরম সিল্কের শাড়িতে মেয়েটিকে বিষ্টিধোয়া ফুলের মতো দেখাচ্ছে। ভারী ভাল লাগে বলাইয়ের। চুরি করে দেখতে সাধ যায় ঐ সুন্দর গন্ধমাখা চুল, ফুলের মালা জড়ানো খোঁপা। আর যা-ই হোক বাবুদের বাড়ীর মেয়ে বৌ-রা বেশ সাজতে জানে।

নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে এরা। কথায় বার্ত্তায় যেন বোঝা যায়। কোন এক তুলিকা, যার সম্পর্কে মেয়েটির কোন আগ্রহই নেই। সেই ন্যাকা মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে। পাত্র অবশ্য এই ছেলেটির ভাই। আর নেমন্তন্ন-র ভার অবিশ্যি এই ছেলেমেয়ের ওপরে। কিন্তু মেয়েটি খুবই

চিন্তিত। যা মেয়ে তুলিকা। কি হ্যাকা বৌ আনছেন তোমার খুড়তুতো দাদা, জাননা তো।

—হোক গে হ্যাকা, তাতে তোমার আমার কি ঊর্মি? দাদা যা বিয়েপাগলা হয়েছিলো।

—আচ্ছা, বৌ-ভাতের দিন সেই সাদা বেণারসীখানা পরবো?

—কক্ষনো না। তাহ'লে বৌ ফেলে সবাই তোমাকেই দেখবে।

—ইস্।

—কেন, তোমার মতো দেখতে একটা মেয়েও সেদিন আসবে?

বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জ, নিউআলিপুর বেহালা—বঁড়শে। আলিপুর, ভবানীপুর, পার্কস্ট্রীট, শ্যামবাজার ঘুরে আবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরতে রাত সাড়ে ন-টা। হিন্দ্ সিনেমা থেকে সেকেণ্ড শো ভাঙা যাত্রী দুজন ডাকতে থাকে। শুনেও শোনে না বলাই। ট্যাক্সির বাতি নিভিয়ে সে বাড়ীর দিকে চলে। রয়েড্ স্ট্রীটের মোড়ে উগ্র রঙমাখা এক ফিরিঙ্গী মেয়েকে জাপটে নিয়ে এক ফিরিঙ্গী বুড়ো ট্যাক্সিকে ডাকে মাতোয়ালা গলায়। কিন্তু শুনেও শোনে না বলাই।

বাড়ীতে ফিরতে না ফিরতে ভোমরা ঝাঁপিয়ে আসে।

—হ্যাঁ গা, কত পেলে?

—হ্যাঁ। এই প্রশ্নই করবে তার বৌ। দিনের পর দিন। তখন খিঁচিয়ে জবাব দেবে বলাই। কিন্তু আজ যদিও ক্লান্তিতে পা ভেঙে পড়েছে—আর দাঁড়াতে পারছে না সে—তবু এ প্রশ্নের জবাব তাকে দিতেই হবে।

খাটের পরে থলি উপুড় করে বলাই! পঞ্চাশটাকা বারো আনা। চেয়ে থাকতে টাকা পয়সাগুলোকে আশ্চর্য কোন দেবতার দান বলে মনে হয় বলাইয়ের। যেন এ তার হকের ধন নয়। যেন এর মধ্যে সুধীর আর মোটর কোম্পানীর খাতে পঞ্চাশে চল্লিশ টাকা, এখনি সরিয়ে

রাখতে হবে না। বলাই-এর আজ তার বাপ নিতাইচাঁদের কথা আবার মনে হলো। মনে হলো বাপ শেষ বয়সে মাসে শ' দেড়েক আনতো। একদিনে পঞ্চাশটাকা কামিয়ে এসেছে তারই বলাই—এ যে এক আশ্চর্য কথা। বাপ তা দেখল না।

টাকাপয়সা গুনে-গেঁথে বাপের আমলের ভারী লোহার সিন্ধুকখানায় তুললো বলাই। বললো...

—কাল একবার খেয়াল করে পাকপাড়ায় একখানা চিঠি ছেড়ে দে' দিখিনি। কেষ্টাকে খবর দেবো। রাত বিরেতে সঙ্গে সাথে রইবে। সময়টা খারাপ রে। রাত পড়লে কেউ একলা থাকে না কো। রাতের সওয়ারে কলকাতার শহরে পয়সার লুট। কেষ্টটা দিব্যি গ্যাটা আছে।

বলাইয়ের ঘেমোগেঞ্জী এই রাতে সাবান দিয়ে দিতে হবে। বলাই স্নানের জোগাড় করে। বৌ বলে—চিঠি লিখতে বয়ে গেছে। মামীর ছেলেকে ডেকে কাজ দোব? কেন? কি উপকার করেছে মামী আমার? কারখানার ছেলেরা দাদা-দাদা করে। তাদের ডেকে নাওনা কেন? আমায় বরং ট্যাক্সি ক'রে ঘুইরে নে' এসো একদিন পাকপাড়া। ঐ মামী আমায় কম কষ্ট দেয়নি গো! মায়ের আটভরি সোনা ছিল। দিইছিল? একজোড়া রুলি আর কানপাশা দে' বে' দিয়েছিল ভুলিনি বাবু!

—মা যে তোরে তাবিজ আর ছেকল বিছে দিলে?

—মা কি একটা সোজা মনের মানুষ! আর মা-র জিনিষ আমারে দিয়েছে-সে কথা বলোনি। আমি বলছি মামী মামা আমার সঙ্গে ধম্ম করেনি।

আজকে বলাই তাকে খুব ভালবাসবে এই সাধ ছিলো ভোমরা-র। খোঁপা বেঁধে পাউডার মেখে সেজে বসেছিলো ছাপের শাড়া পরে। কিন্তু আজই বলাই যেন ক্লান্ত হয়ে এসেছে। ভাত মুখে দিতে না দিতে গড়িয়ে পড়লো বিছানায়।

শুয়ে পড়লো ভোমরা-ও।

॥ ছয় ॥

বলাইয়ের ট্যাক্সি দেখে সুধীর নয়, বিজলী-ই যেন কেমন একটু ছোট হয়ে গেল। বলাই বললো বটে অনেক কথা, সে যেন তার কানে নিল না।

একটু মোটা দাগের মানুষ বিজলী। জেনে শুনেই তো তাকে বিয়ে করা! আর বিয়ে হয়ে এসে থেকে স্বামীর কাছে শুধু বলাই, বলাই! বলাই তার পয়লা বৌ-কে বড় ভালবাসতো! বলাই না কি সুধীর বলতে অজ্ঞান—বলাইকে এ সংসারে আপন করে নেওয়া-ই না কি বিজলীর একটা প্রধান কাজ!

বিজলী এখন বসে ডালের কড়ায় কাঁটা দিয়ে নেড়ে ডাল সেদ্ধ হলো কি না দেখে। তারপর আটা ঠাসতে ঠাসতে ভাবে তার মন্দকপালের কথা। স্বামীর কথা মতো সে বলাইকে আপন করে নিতে চেষ্টা করেছে বৈ কি। তবে কেমন যেন ধাত চড়া মানুষ বলাই। যতই স্নেহ ভালবাসা দেখাও না কেন, ঐ শক্ত ঘাড় নোয়াতে চায় না। তাই বলাইয়ের ওপর বিজলীর যত রাগ।

আর তার স্বামী। বিয়ে করার সময়ে বিজলার বাপ যে পঞ্চাশটা কড়ারে কবুল করিয়ে নিয়েছে সুধীরকে, সে কি বিজলীর দোষ? আর দোজবরে হোক, যা হোক, মানুষটাকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছে বিজলী। সে যেমন জানে, তেমনি ভাবে সেজে গুজে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেমন যেন এক বেয়াড়া জাত ওরা। ষোল আনা মনপ্রাণ দেয় না। দেয়—অথচ চার আনা যেন হাতে ধরা থাকে। তাই তো রাগ হয় বিজলীর।

সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, সুধীর যেন তাকে নিরন্তর শান্তিলতার সঙ্গে তুলনা করে চলেছে। সুধীর যদি অনেক কথা কইতো—কইতো যে তুমি তার মতো নও—না রূপে, না গুণে, না ব্যাভারে। তবে গলা ছেড়ে ঝগড়া করতো বিজলী। কিন্তু মুস্কিল হলো, যে সুধীর তার নাম করে না। কখখনো বলে না। এই যে ঠাণ্ডায় কুঁকড়োয় না, জলে ভেজে না, আগুনে তাতে না—এমনি ধারা ঠাণ্ডা রক্তের মানুষ বলে সুধীরের ওপর বড় রাগ হয় বিজলীর।

খারাপ ব্যবহার করে দেখেছে, নুন ঢেলে দিয়ে রান্না পুড়িয়ে দেখেছে—কোন ভাবে সুধীরকে একটা কথা কওয়াতে পারেনি বিজলী। কেন? কিসের এমন গা ছাড়া ভাব তার? বিজলী কি বানের জলে ভেসে এসেছে? তুমি তাকে সেধে বিয়ে করে আননি? আর কৃতজ্ঞতায় ভরপূর মন নিয়ে-ই তো এসেছে বিজলী। বিজলীর বাপ যে সাংঘাতিক মানুষ—তার হয়ে সেই কবে থেকেই তো এর তার সঙ্গে ঘুরে পয়সা এনেছে বিজলী। যে বদনাম রটে গিয়েছে পাড়ায়, কোনদিন কি বিজলীর বিয়ে হতো? বিয়ে হয়ে গিয়েছে যবে থেকে, তবে থেকেই তো বিজলী অনেক ফন্দী এঁটে রেখেছে—যে স্বামীকে বশ করবে, সুখের সংসার পাতবে। কিন্তু কেমন সব বানচাল হতে বসেছে দেখ!

বাপ হয়েছে তার আতঙ্ক। মাসে অমন চারবার কালীবাবু সাদা ছাতা মাথায় দিয়ে এসে উপস্থিত হয়। জামাই-এর কাছে নয়, মেয়ের কাছে! হাজারটা অভাব অভিযোগের কাহিনী গলায় নিয়ে সে সকরুণ মিনতি শুনলে পরে থাকতে পারে না বিজলী।

দেয় টাকা। আবার এ-ও জানে, যে এই টাকা দিয়ে সে কোনদিন কালীর খাঁই মেটাতে পারবে না। নিজের বাপ হলে কি হয়! বিজলী ভালভাবেই জানে কালীবাবু মানুষ সুবিধের নয়। অন্ততঃ কোন পরিচিত লোকই কালীবাবুর পরিচয়ে তাদের চিনতে চায় না। এড়িয়ে যেতে চায়।

বিজলীর দুঃখ অন্যখানে। বিজলীরও যে একটা মন আছে, আর সে মনে দুঃখ হতে পারে—এ জানলে বোধহয় অবাকই হয়ে যাবে সুধীর। বিজলীর শরীরটার যৌবনই শুধু দেখলো সুধীর। মনটা তো দেখল না? দেখল না, যে মেয়েটাকে বিয়ে করেছিলো সুধীর—সে মেয়েটা শুধু বাপের কড়ার সর্তমতো সুধীরের সম্পত্তির ভাগ নিতে আসেনি। সে সুধীরকে দেখেছে জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে কতদিন! দেখেছে মুখ মলিন, জামাকাপড় ছেঁড়া ময়লা—অযত্নের চেহারা। দেখে দেখে তার মনে দুঃখ হতো। সেই মানুষটাকে বাড়ীতে ডেকে আনতো তার বাবা। আর বিজলীকে ভালজামা শাড়ী পরিয়ে পাঠাতো তার কাছে—জল নিয়ে, সরবৎ নিয়ে, খাবার নিয়ে, পান নিয়ে।

বিজলীও গিয়েছে। হেসে কথা কয়েছে। মুখ শুকনো উপোসী মানুষকে যত্ন করলে খুশী লাগে না এমন পাষাণ মেয়ে তো নয় বিজলী। সে কোনদিন বলেছে

—এখন তাতে নাই বা বেরুলেন! একটু বিশ্রাম করে যান!

সুধীর মলিন হেসে বলেছে

—এখন না হয় বসলুম। কিন্তু চিরদিনের রোদ তাত কে ঠেকাবে?

তখন বিজলীর মনে পড়েছে, না, মানুষটার তো ঘরে বউ নেই। মনে পড়েছে, হ্যাঁ—ফর্সা শান্ত চেহারার একটি কপালে সিঁদূরলেপা বৌকে দেখেছে আগে আগে সুধীরের সঙ্গে এক রিক্সায় ফিরতে। বুঝি ভালবাসার বউ ছিল! বুঝি মনটা আর বুকটা ভরে রাখতো সেই বউ। সেই বউ চলে গিয়েছে, তাই কি সুধীরের মন অমন কাঁদে?

তাই যখন বিজলীর বিয়ের ঠিক হলো সেই সুধীরেরই সঙ্গে—বিজলী একটা ভালবাসার মন নিয়ে-ই এসেছিলো। বিয়ের আগে তার বাবা যখন সুধীরকে বসিয়ে কড়ায় ক্রান্তিতে পাওনা গণ্ডার হিসেব করছিলো—তখন ভেতর থেকে সে কথা শুনে লজ্জায় মরে গিয়েছিলো বিজলী! বাপ ঘরে এসে বলেছিলো—বলবি আমার বাড়ী সারাতে দুশো টাকা দেয় যেন!

ছি! লজ্জায় মরে বিজলী বলেছিলো—পারবনা বাবা!

—পারবনা বাবা!

ভেঙিয়ে উঠেছিল কালীবাবু। আর বিজলীর মা ভয়ে লজ্জায় কোন কথাই কইতে পারেনি। কালী বলেছিলো

—নিচে এয়েছে! যা যা কাপড় ছেড়ে যা! তোর মা চা-খাবার পাঠিয়ে দেবে খ'ন। তোরা দুটিতে গল্প করিস বসে! আর অমনি তক্কে তক্কে মেরামতের টাকাটার কথা পাড়বি। আমি-ও থাকব বারেণ্ডায়। তোর ইসারা দেখলেই উঠে আসবখ'ন! তুই কথাটা পাড়বি শুধু। আমি বাকি কথাটা বলে করে নোব খ'ন!

—বাবা, আমি পারব না গো!

তখন কালীচরণ ইতর এবং বিশ্রী একটা মুখভঙ্গী করে এগিয়ে এসেছিল। ভয়ে বিজলী কথা কইতে পারেনি।

আজ আঁধার রান্নাঘরে বসে মাখা আটার উপর বিজলীর চোখের জল টপটপ করে পড়ে। ভয়ের কথা তো জানেনা সুধীর। কতরকম ভয়ের ভেতর দিয়ে তার জীবনটা কেটেছে। জাত-জুয়াড়ী, নীতিহীন একটা মানুষ কালীচরণ! বিজলী হলো তার পয়সা উপার্জনের উপায়! নিচের ঘরে যে সব মানুষ এসে বসে, বিজলীকে গিয়ে তাদের খাবার, পান দিতে হতো! সে ছিলো ভালো! তারপর একদিন কালীচরণ বিজলীকে ঘরের কোণে ডেকে বললো

—বিজলী, মা—তুমিই আমার ছেলের সমান! বুঝলেনা মা, আজকাল মেয়ে-রা সব বাপ মা-কে করে কর্মে এনে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে! এ জানবে তোমার কর্তব্য!

বিজলীর মা ঘরে ঢুকে বলেছিল—আবার তুমি মেয়েকে ও সব কথা কইছ? আমাকে সারাটা জীবন জ্বালিয়েছ, আবার মেয়েটাকে?

মা-কে ঘর থেকে বের করে দিয়ে কালীচরণ মেয়েকে বলেছিল—পানুবাবু আসলে পরে একটু বেশী ক'রে খাতির করবে, জানলে মা?

ঝদি সিনেমা নে' যেতে চায়, যাবে তাতে দোষ নেই কো! তোমাকে স্নো পমেটম এনে দিলে মাখবে! এইটুকু—শুধু এইটুকু বলছি, জানলে মা!

কালীচরণ বিজলীর শৈশবে, বছর আষ্টেক গা ঢাকা দিয়েছিলো রাণীগঞ্জে, আরো কোথায়! দীর্ঘদিন না দেখায়, বাপ সম্পর্কে ভয়-ভীতি বিজলীর খুব! একটা কথা কইতে এতবার 'মা' বললো কালীচরণ, যে সে ভয় বাড়লো বই কমলো না!

আরো কত ভয়! বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কতরকম যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা! ঘরে এসে বাপের পা ধরে কান্না—। বাপ বলে

—খেটার করবি, তাতে-ও ভয়? ঐ কালো ধুমসী দেখে কেউ ঘেঁষবে না জানলি! ঘেঁষলে জানবি তোর বাপের ভাগ্যি।

তারপর ঠিক ঠিকমতো টাকা না এলে বাপের হাতে মার খাবার ভয়। সুধীর কি তা জানে?

এই ভয়ের বশবর্ত্তী হয়েই সেদিন বাধ্য হয়ে বিজলী নিচের ঘরে এসে সুধীরকে হাতে আঁচল জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছিলো

—বে' হবে কি ভাঙ্গা ঘরে? বাবা বলছে ঘর সারিয়ে দিতে!

সুধীর তখন কি রকম ঠাণ্ডা-চোখে চেয়েছিলো বিজলীর দিকে—সে কথা ভাবলে আজ-ও বিজলীর বুকটা হিম হয়ে যায়। আংটিটা নাড়া-চাড়া করছিলো সুধীর—আঙ্গুলে ঘোরাচ্ছিলো—আর ঠাণ্ডা, নিষ্পলক, বিষণ্ণ এক ফুর্ত্তিহীন চোখে চেয়ে-চেয়ে যেন বুঝতে চেষ্টা করছিলো—কাকে বিয়ে করতে চলেছে সে! চা-য়ে সর পড়ছিলো—একটা পিঁপড়ে রসগোল্লার রসে ডুবে মরছিলো শুঁয়ো নেড়ে-নেড়ে। দেখতে দেখতে বিজলী বলেছিলো

—আমি নয়, বাবা বলেছে! না বললে পরে বাবা আমাকে—

সুধীর তখন দেঁতো এবং সব বোঝা হয়ে গেছে গোছের একটা হাসি হেসেছিল। বলেছিল

—দোব খ'ন। তবে বাবার হয়ে অমন করে তুমি চেও না। ঘরে আমার টাকার গাছ নেই। নাড়া দিলেই পড়বে না!

বিজলী ভেবেছিলো, এখন আমাকে তুমি মনে করছ বাপের হাতে ধরে শেখানো পড়ানো! কিন্তু এই আমি-ই যখন ঘর করতে যাব, তখন দেখো আমি আসল মানুষটা কি রকম। ভেবেছিল, গিয়ে সে সংসার করবে বেঁধে! ঘরদোর স্বামীসংসারের স্বাদের জন্য মনটা তারও অস্থির। সুধীরকে আদর যত্ন করে সে অনেক দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। যে বৌ মরে গেছে, তার নামে একটা কথা ও কইবেনা! শুধু আদর যত্ন আর ভালবাসা দিয়ে সে সুধীরকে বশ করবে। কিন্তু সে কপাল তার হলো না!

ব্যবসাদারী করে পাওনা থোওনা বুঝে বিয়ে হলো। কনের ঘর থেকে বরের ঘর নয়—বরের ঘর থেকে কনের ঘরে তত্ত্ব গেল, টাকা গেল, গয়না গেল! আর কনের ঘর থেকে এলো সুবল! কালীচরনের মেরুদণ্ডহীন অপদার্থ ছেলে! বিজলী-ই বলেছিলো

—বাবার কাছে জন্ম কাটলো। শিক্ষাদীক্ষা পেল না—ওরে বেশ ইস্কুলে দিতুম! আমার-ও সঙ্গী হতো।

সুধীর আপত্তি করেনি। কিন্তু যা যা চেয়েছিলো বিজলী, তা হলো কি? বিশবছরের বেয়াড়া ছেলেকে বাগ মানানো চারটিখানি কথা নয়! সুবল ভগ্নীপতির ওপর অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে-ই এসেছে। দোজবরে ভগ্নীপতি তাকে যখন খুসী চাইলেই টাকা দেবে। সিল্কের ফুরফুরে হাওয়াই সার্ট পরাবে! বাপের ঘরে যে সব সুবিধে ছিলনা এখানে সে সব সুবিধে মিলবে।

আর সেই ঘৃণ্য জীবন! সে জীবনই কি তাকে ছাড়লো! পচা পাঁকের ছড়ার মতো তাকে অনুসরণ করে করে এলো এখানে। বাপ বিয়ের দু-মাস না যেতে-ই টাকা ধার করতে সুরু করলো! মাসী তার ছেলেপুলে নিয়ে এলো ঘাড়ের ওপর যখন তখন! যেন নিজের জীবন

থাকতে নেই বিজলীর! যেন স্বামীকে একটু আদর যত্ন করে নিরিবিলি জীবন কাটাতে সাধ যায় না তার।

সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো—যে স্বামী তাকে বোঝেনি। বিজলীর বাইরেটা একটু খোলামেলা, হাঁকডাকের স্বভাবের! স্বামী তাকে এমন ভাবে দেখলো, যে ব্যবসাদারীর হিসেবটা টেনে রাখলো দুজনের মধ্যে-ও। বিজলীকে সে টাকা দেবে, স্বাধীনতা দেবে, গয়না কাপড় দেবে—। তাকে ভাল ও বাসবে। তবে ঐ একরকমে! বিজলী যতই চেষ্টা করে এমন সুখের পায়রা-র সোনার খাঁচা ছেড়ে সুখদুঃখের সাথী হতে—ততই দেখে সুধীরের মনে একটা কাঁচের দেয়াল আছে। কাছে যেতে দেবে, দেখতে দেবে সে কাঁচের স্বচ্ছ ঢাকনার ফাঁকে বুকখানা। দেখ গো বুকটির জ্বালা আমার মেটেনি! আজ ও মনটা আমার তেষ্টায় হা হা করছে।

ব্যাস্ ঐ চোখের দেখা পর্যন্ত-ই। সে দুঃখ মেটাতে দেবেনা বিজলীকে। ততখানি কাছে যেতে দেবেনা! অর্থাৎ অদ্ভুত একটা জোড়াতালির বুঝ। হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করেছি। তবে তোমার বাপ বুঝিয়ে দিয়েছে, এই মেয়েকে এই সব দাম দিয়ে তবে ঘরে নিতে হবে। তা দিচ্ছি দাম! তুমি আমার অনেক দামের বৌ। তুমি সুখে থাকো। আমার সুখের ভাগী তুমি। দুঃখের ভাগী নও। সুখটুকু তোমার। তবে যে কারণে মানুষ স্ত্রী চায়, তেমন দুঃখের বন্ধু তুমি হতে পারবে না। এখন তো আমার অনেক সুখ বিজলী। আমি ঝি রাখতে পারি। ঘর খরচা চার পাঁচশো করতে পারি। আমার-ও তো দুঃখের দিন ছিলো। সেই দুঃখের দিন, আর সকল দুঃখকষ্ট নিয়ে একজন মানুষ চলে গিয়েছে। সেই মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমার-ও সাধ কামনা চলে গিয়েছে। সত্যি কথা বলি বিজলী, তুমি যখন বিয়ের আগে আসতে আমার কাছে, তখন সেই সব মরা সাধ কামনার গাছে যেন একটু প্রাণের বাতাস লেগেছিল। ভেবেছিলাম তেমন ফল ফুল না হোক, কচি কচি

সবুজ পাতায় হয়তো ঢেকে যাবে এই নগ্নতা। আর আমি-ও একটু জুড়িয়ে বাঁচব।

কিন্তু তুমি বোধ হয় তেমন নও। তাই সে সব কথা থাক। তুমি যা চাও তাই করো। তোমার জীবন নিয়ে তুমি, আর আমার জীবন নিয়ে আমি। যে যার মতো থাকি।

বিজলী আজ যেন বুঝেছে, যে সুধীর মনের চোখে তাকে শান্তিলতার সঙ্গে তুলনা করে দেখেছে। শান্তিলতা-ব ওপরে বিজলীর মনে এতটুকু হিংসে ছিল না—কিন্তু সে কথা সুধীর বুঝলো কি? সতীন কাঁটা বুঝি একেই বলে। সে ত' ভাগ্যিমানী। নিজের ভাগ্যে স্বর্গে গিয়েছে। তবে বিজলী আর সুধীরের মাঝখানে এমন একখানা আড় ছাঁদের বাঁকা ছায়া ফেলে রয়েছে কেন শান্তিলতা? স্বামীকে খুশী করবার জন্যে, একদিন সতীনের বিবর্ণ ছবিখানায় সিঁদূর ফোঁটা দিয়েছিলো বিজলী। দেখে খুসী হওয়া দূরে থাক, সুধীর বর্বর হয়ে উঠলো। বললো

—কেন তাকে ঘাঁটাচ্ছ? সে তোমার কি করেছে? কেন তার ছবিতে হাত দিয়েছ তুমি?

বিজলীও রেগে গিয়েছিল। কোমরে হাত দিয়ে ঝগড়া করে বলেছিলো

—তারে-ই যদি নিরন্তন জপ করবে, তো আমারে বে' করলে কেন?

বিশ্রী একটা ঝগড়া হয়েছিল। আর নিচে দাঁড়িয়ে সবটুকু ঝগড়া শুনে বলাই সুধীরকে নিয়ে গিয়েছিলো। বলে গিয়েছিল

—সুবল, বৌদিরে বলে দিও যেন। দাদা আজ রেতে ঘরে খাবে নাকো!

বিজলীর আজ-ও মনে পড়ে সেদিন মাংস রান্না হয়েছিলো। অনেক শখের রান্না বিজলীর। এ-ও মনে পড়ে যে এই ঝগড়ার পরে সেই মাংস পুড়ে ধোঁয়া বেরিয়েছিলো। মাংস পোড়া গন্ধটা যেন বিজলীরই মনের ক্ষোভের গন্ধ ছড়িয়েছিলো।

বলাই-য়ের ওপর বিজলীর রাগ-ও কিন্তু সেই থেকেই শুরু। শান্তিলতা-র তরে যেন ওই বলাইয়ের-ও মনের জ্বালা পোড়া রয়েছে! আর বিজলীর একথা-ও মনে হয়েছে, নিরন্তর ঐ বলাই বিজলীর সঙ্গে শান্তিলতার তুলনা করে চলেছে। সুধীরের কাছে আসবার চেষ্টাগুলো যেমন বিজলীর ভেঙে ভেঙে গিয়েছে, তেমনই ঐ বলাইয়ের ওপর রাগ তার জমে উঠেছে নানা কারণে। তাই বিজলী-ও খোঁচা মেরেছে।

স্বামীকে বশে আনবার জন্যে বিজলী মা মাসীর কাছে শেখা তুক্‌তাক্‌ করেছে। নিজের চুলের নুটি-তে সিঁদূর গোলা জবাফুল দিয়ে। স্বামীর মনের বিরাগ লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে তাড়িয়ে। এই সব করেছে, আর মুখে টিপ্পনী কেটে বলাই আর সুধীরকে জ্বালিয়েছে।

—সতীন তাড়াচ্ছি বাবু! ঝে আমার সুখে বাদ সাধে, সে যেন পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে পড়ে।

নানারকমে যখন বিফল হয়েছে বলে নিজে জেনেছে, তখন বিজলী সুধীরকে জ্বালা দিতে অন্য রকম ফন্দী করেছে। এর তার সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি, হাসি মস্করা! সেদিন সই আর সইয়ের বর রমণবাবু-র সঙ্গে সিনেমা দেখে এল। সই যদি অপর পুরুষের সঙ্গে হাসি মস্করা করে, তো রমণবাবু তারে ঢিপিয়ে দেয় আচ্ছা করে।

সুধীর যদি তাকে নিজের বলে মনে জানে, তো তেমনই হিংসে করুক! মারুক দু' এক ঘা! সে ঘা-ও সইবে বিজলীর!

বলাইকে শত্তুর জেনে থেকে বিজলী স্বামীকে তার বিরুদ্ধে মন বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। টাকা দেবার আগে তার খুব আপত্তি ছিলো। সে কথা মানেনি সুধীর।

এখন এই যে আজ বলাই এসেছিলো, মনে পড়তে গা জ্বলে গেল বিজলীর। যেন বিজলীকে ট্যাক্সি দেখিয়ে গা জ্বালাতে এসেছিলো। বলাইয়ের ভাব ভঙ্গীতে ঐ টেক্কা দেবার ভাব দেখলে পরে

গা জ্বলে মরে বিজলী। বলাই যেন ভাবে ভঙ্গীতে বোঝাতে চায়, দেখ স্থধীরের ওপর আমার কতখানি দখল!

রান্নাঘরের পাট এতক্ষণে সারা হলো। ডাল, তরকারী, মাছ, রুটি, ভাত সব তাকে সাজিয়ে আলমারী বন্ধ করে বিজলী। দই পেতে রাখে উন্মুন পাড়ে। রান্নাঘরে শেকল তুলে ঘরে এসে কাপড়, গামছা, সাবান হাতে নিয়ে একটু দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে আঁধারের দিকে! কি ছিলো সেই মানুষটার? যা বিজলীর নেই? রূপ? না গুণ? না কি? জানলে একবার চেষ্টা করতো বিজলী।

॥ সাত ॥

ভোমরাকে নিয়ে পাইকপাড়ায় যে গেল না বলাই, সে নেহাৎ সময় হলো না বলে। ভোমরা-র অবিশ্যি মামা মামী-কে তাক লাগিয়ে দেবার খুব ইচ্ছে ছিলো। বাপ মরে যেতে মামাবাড়ীতে এসেছিলো ভোমরার মা। মা মরতে পড়লো একেবারেই মামার ঘাড়ে। মামা মামীর বশ। মামী মারতে বললে কাটতে ছোটেন! ভোমরার মিষ্টি মুখখানা আর চালাকচতুর স্বভাব তাঁদের চক্ষু শূল না হোক বিরক্তির কারণ হলো। ভোমরা-র মামার-ও তিন মেয়ে। তাদের নাম ছন্দা, মন্দা, নন্দা! নামের ঝঙ্কার মিষ্টি, কিন্তু মেয়েদের রং-ও কালো—চেহারাও ভাল নয়! ভোমরার বিয়ে হয়ে যেতে নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন মামা-মামী, তা-ই বলা চলে।

ভোমরাকে খুশীরাখা দরকার। তাই একদিন মা-বৌ আর ছেলেদের নিয়ে কালিঘাট আলিপুর ঘুরিয়ে আনলো বলাই। আলীপুরে বাঘসিংহ দেখে নাতিদের সঙ্গে বুড়ী-ও খুসী হলো, আর হাতীর পিঠে ছেলে কোলে ভোমরা-ও বসলো।

কালীঘাটে পুজো দিয়ে দোকানে বসে দইমিষ্টি খেয়েনিলো সবাই। বুড়ী-ও তীর্থস্থানে দোষ নেই, এই জ্ঞানে চুপ করে খেলো।

এখন ভোমরা-র আর শুধু হাতে, শুধু কানে বলাইয়ের ঘরে দোরে গুণ্‌গুণিয়ে বেড়াতে ভালো লাগে না। এবার পুরণো হার রুলী বন্ধকীদোকান থেকে খালাস হলো। লক্ষ্মীবাবুর সোনা চাঁদির 'আসলী দুকান' থেকে একজোড়া কানফুল-ও গড়িয়ে এলো। জগুবাজারের

সামনের ফুটপাথে সাড়ে ছ'আনা আর একটাকা চার আনার সরগরম নীলাম বাজার প্রত্যহ! বিক্রেতার মুখচোখ দেখে অবশ্য ক্রেতা ভুল করে, যে এই আশ্চর্য নীলামের অদ্যই শেষরজনী। কিন্তু তা সত্যি নয়।

এবার ভোমরাকে-ও দেখা গেল সেই সব অঞ্চলে ঘুরাঘুরি করতে। ছেলেদের জামা, নিজের সায়া আর শাশুড়ীর কাপড় কিনে আনলো বৌ। সাড়ে ছ' আনার নীলাম ওয়ালার গাড়ী দাঁড় করিয়ে জার্মান-সিলভারের বাসন আর ছাঁকনী কিনলো সে।

পদ্মপুকুরের চড়কের মেলায় ভারী জাঁক। প্রতি বছর সেখানে যায় ভোমরা—আর কাঁচের কাপ, ডিস বাটি, টি-পট—সব দেখে-ই চলে আসে। এইতো সেবার-ও মেলায় ঘুরে বেণু কি জেদ ধরেছিলো। যত কোলে নিয়ে ঘোর, যত পাঁপড় কিনে দাও, ছেলে ভোলে কি? শুধু কান্না আর আবদার

—কাঁচের জোড়া সিংহ নেব!

—কাঁচের জোড়া সিংহ নেবো!

কাঁচের জোড়া সিংহের দাম চার টাকা। কেমন করে ঐ দুরন্ত ছেলেকে যে বশ মানিয়েছিলো ভোমরা! তার নিজের-ও ছেলেমানুষ মন তো! শখ যায় নানারকম। ঐ মাদুর কিনে ঘরে পাতি—কাঁচের একখানা আলমারী হয়, তো বেশ হয়! ঐ মাথানাড়া বুড়ো, হরগৌরী, আর সুভাষ বোসের মূর্ত্তি কিনে রেখে দিই আলমারীতে! কেমন তাজা সবুজ বরণ টিয়াগুলো দেখ! বড় সাধ যায় ঐ টিয়াপাখী নিয়ে এসে খাঁচায় পুষি। আর প্ল্যাষ্টিকের কি এত রকম-ও বেরিয়েছে! সাধ যায় প্ল্যাষ্টিকের ঐ ছোট ছোট কাপডিশ কেটলি চামচ কিনে এনে সাজাই। কেমন দেখতে!

এবার মেলাতে বলাইয়ের বৌ তার মনের সাধ মিটিয়ে ফুটোফাটা কাপডিশ আর কাঁচের গেলাস কিনে আনলো।

মাঝে-মধ্যে জগুবাজারে, মাংসের দোকানের সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বেশ বুঝে সুঝে পরখ করে মাংস কিনতে দেখা গেল বলাই দাসকে।

আর হাজার হলে-ও ভোমরা-র মনটি ছেলেমানুষীতে ভরা। সে যতটা না প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী লোকদেখানোর খাতিরে রাস্তার ওপর থেকে ফেরিওয়ালা ডেকে ছানার মুড়কি, সোনপাড়ি আর কাঁচাগোল্লা সন্দেশ কিনলো।

বেশী নয়, এর ফলে হয়তো চল্লিশটা টাকা সে মাসে উপরি খরচ হলো বলাইয়ের। কিন্তু পাড়ার মানুষের চোখে লাগলো খুব! সারা-দিনমান তেলকালি মেখে ভূত হয়ে এসে সন্ধেবেলা এ পাড়ার ছেলেরা রাস্তার কল ছেড়ে দিয়ে কালো পিচের ওপর জামা আছড়ে কাচে সাবান দিয়ে আর সাবান মেখে স্নান করে। সেই সময় তাদের মধ্যে কথা হলো! রাস্তার জল ফুরোলে পার্কের টিউবওয়েল ভরসা। সেখানে ভীড় করে গিয়ে জমায়েৎ হয়ে মেয়েদের মধ্যে কথা হলো! সকলেই ঘাড় নেড়ে বলাবলি করলো—পয়সা হয়েছে বলাইদাসের! বড় হাত ছেড়ে খরচ করছে আমাদের বলাই! চিরকেলে খাই-অন্ত প্রাণ তো! ঝা পাবে, ঢেলে দেবে পেটে! কোথায় দুটো পয়সা রাখবে—সময় অসময় আছে তো?

বলাইয়ের মনে-ও পাড়ার মানুষের সামনে একটু অহংকার দেখাবার ইচ্ছে জাগে বৈ কি! তাই প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলতে ফিরতে ইচ্ছে ক'রে নিজের পাড়া দিয়ে শর্টকাট্ করে। নিজের পাড়ার প্যাসেঞ্জার পেলে বলাই প্রথমেই কথাবার্তা কয়ে নিজেকে খেলো করে না! তবে প্যাসেঞ্জার যখন বলে—শ্যামপুকুর! তখন বলাই বলে

—মেজদা-র শ্বশুরবাড়ী তো? বলতে হবে না।

তখন স্বতঃই কথাবার্তাটা ট্যাক্সি কেনার চারিপাশ দিয়ে ঘুরপাক খায়। যারা দোতলা তেতলা পৈতৃক বাড়ী চুলচিরে ভাগ করে ভাড়া

দিয়ে দুখানা ঘরে গাদাগাদি করে থাকে আর সস্তামাছের ঝাল খায়, সেই সব সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্তের মনটায় নানা কথা লাটপাট খায় প্যাঁচখেলা ঘুড়ির মতো! বাপের তৈরী বাড়ীই যাদের সঙ্গতির উপায়—তাদের কাছে বলাইকে শুধু-ই যে এক হিম্মত আর কলিজাওয়ালা পুরুষ বাচ্চা মনে হয় তা নয়। তারা ভাবতে চেষ্টা করে এর মধ্যে বিরাট একটা গলদ আছে নিশ্চয়। নিশ্চয় একটা লুকোন ইতিহাস আছে। শুধু শুধু-ই আর বলাই, নিতাইচাঁদের পুত্র হয়ে ট্যাক্সি বাগায়নি। কোন একভাবে কোন ঝোপে কোপ মেরেছে বলাই! তবে কোথা দিয়ে যে কি হলো, সেটাই ভাবতে চেষ্টা করে তারা! বলাই তাদের প্রশ্নের জবাবে খুব জ্ঞানীগুণীর মতো দুটো একটা মন্তব্য করে—'Owner driver হলে কি হয়! Hire purchase-এর ব্যাপারটাই বা কি! যত শোনে তত চমকায় আরোহীরা!

সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে তারা-ও বলে—দু'হাতে পয়সা লুটছে ছেলেটা! দু'হাতে! এখন মাথা না বিগড়ে গেলে বাঁচি! একটা কথা দশটা কানে কানাকানি হয়ে ওজনে ভারি হয়। এমন ভারি হয়, যে সেকথা আর নিজের কাছে ধরে রাখা চলে না। পুরুষরা বলাইকে উপদেশ দিতে আসে। বলে—ব্যাঙ্কে খাতা খোল—নয় পোস্টাপিসে একখানা বই করে রাখ ছেলের নামে। ঘরে অমন করে টাকার কাঁড়ি জমাসনি। শেষকালে বলা তো যায় না। যে দিনকাল। কোথা থেকে কি বিপদ হয়ে যায়।

বলাই বলে—নিশ্চয়। আর কিছু না হোক, ভগবানের দয়ায় ধার-ধোরগুলো যদি সামলে নিতে পারি, তবে বেণুর নামে ক্যাসসার্টিফিকেট কিনে দোব।

পাড়ার মেয়ে বৌ-রা—যারা জনমকালে রূপোর চুড়ি, কাঁচের ঝুটো দুল আর কালোসুতোয় পয়সা ফুটো বাঁধা ছাড়া অন্য গহনা জানলো না তারাই যেচে যেচে উপদেশ দিতে আসে। বলে—এতদিন ঝা করিছিস,

এখন ঝ্যান আর শোভা পাচ্ছে না জানলি ভোমরা? নয় একটা ঠিকে লোক রাখ্। নয় আট ভরি দে' আটগাছা চুড়ি গইড়ে নে! ঐ পক্ষীদিদির গুমোর ভাঙুক! মনে ভেবে রেখেছে যে এ তল্লাটে ওর মতো কেউ গয়না গড়াতে জানে না!

কেউ বলে যায়—

—একশো টাকা দে রেডিও কিনতে পারিস না? কেমন সব কলকেতার সেট বেইরেছে। কেমন ঝলমলে দেখতে! শুকুরবারে থেটার শুনবি—ফিলিমের গান শুনবি!

বলাইয়ের মা এক কানপাতলা বুড়ী। ছেলের রোজগারের পয়সা এখনো চোখে দেখেনি। তবু যখন মিসিরের বৌ কালোমিশি দাঁতে টিপে দিয়ে বলে

—আমাদের বলাই তো খুবই কামাচ্ছে গো! বড় খুশী হয়েছি আমরা! তা পিসী, তুমি তোমার ঘরদোরের ফাটাফুটো এবার সারিয়ে নাও?

বুড়ীর অকর্মা ভাইপো অনেক ছেলেপুলের বাপ। সে এসে বসে বসে পিসীকে তোলা দেয় আর মিষ্টি খায়। ভোমরার হাত থেকে পান নিয়ে বলে

—এবার পিসেমশায়ের নামে গয়াতে একটা কাজ করিয়ে দিও গো পিসী! তেনার শান্তি হবে।

চলে গেলে পরে ভোমরা বুড়ীকে বুঝিয়ে বলে—তেতেপুড়ে তিনটেয় ঝখন খেতে আসবে, চট করে যেন বলে বসোনি কিছু! হ্যাঁ! জানো তো ছেলের মেজাজ! শুনবে, আর খপ্ করে জ্বলে উঠবে মানুষ।

তখন বোঝে বুড়ী। আবার এক একদিন ব্যাবুঝ হয়ে বসে থাকে। সে সব দিনে হয়তো বা বাতের ব্যথা বা অম্বলের জ্বালা চাগায় বুড়ী-র। প্রকাশটা হয় আশ্চর্য রকম! সারাদিন-ই মেজাজ খারাপ! যেন গরম তেলে জলের ছিটে পড়ছে আর ছিটপিটিয়ে উঠছে। বৌ-কে বলে চিপ্‌টেন কেটে

—চুপ কর্ বাবু। আমি আমার ছেলের সঙ্গে কথা কইব, তাতে উনি এলেন চিপ্‌টে ফোড়ন দিতে।

সেদিন বলাই তেতেপুড়ে দিনান্তে ফিরতে না ফিরতে বুড়ী বলে ওঠে

—হ্যাঁ বলাই, টাকাগুলো যে নয়ছয় করছিস্—আমার ঘর তুই সারিয়ে দে। তোর বাপের পিণ্ডি দে' আয়।

—তার আগে নিজের পিণ্ডি দেব। বলে ক্ষেপে ওঠে বলাই। ভোমরা তখন দুজনকে-ই সামলায়! বলাই বলে—এখনো তিন মাস পুরলো না, টাকা দিলাম না কোম্পানীকে, সুধীরদাদারে—আমার টাকা দেখেছে সব সুমুন্দীরা! কোথায় টাকা? আগে দেনা শুধে প'স্কের হই। তারপরে সব কথা।

—নিচ্চয়! নিচ্চয়। ব'লে ভোমরা স্বামীকে হাত পাখা দিয়ে জোরে জোরে বাতাস করে।

এত বোঝে ভোমরা, এমন লক্ষ্মী মেয়ে। এমন করে সে ধৈর্য সহ্য জানে—তবু একলা ঘরে আঁধারে ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে তো দোষ নেই? চোখ চেয়ে চেয়ে চুরি করে স্বপ্ন দেখে! লাখটাকার স্বপ্ন-ও নয়—আর কাঁথাখানা-ও তার ছেঁড়া নয়। স্বপ্নটা হাজার দুয়েক টাকার। ভোমরা স্বপ্ন দেখে হার, চুড়ি, বালা, তাবিজ, কানবালা-র। নতুন নতুন ডিজাইনের সব ঝকমকে গয়না ভোমরার ঘরের আধার খানায় যেন লোভ দেখিয়ে চমকায়। সে সময় ভোমরা-র কিছু-কিছু কথা মনে থাকে না। তার মনে পড়তে চায়না, যে সবে ট্যাক্সি এসেছে হাতে! মনে পড়তে চায় না, যে অত্যধিক পরিশ্রমে বলাইয়ের পাঁজরা বেরিয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়ছে মানুষটা-র।

॥ আট ॥

এবার সুধীরের কিস্তির টাকা যখন দিতে গেল বলাই—অভ্যর্থনায় সৌহার্দ্যের সবিশেষ অভাব দেখা গেল। সুধীর বললো বটে

—বোস্ বলাই' চা খা!

কিন্তু গলাটাই শুকনো শুকনো ঠেকলো। দুশো টাকা হাতে নিয়ে সুধীর বললো

—কত হলো বলাই?

—কেন, ছয় শো দিলাম? তোমার হিসেব নেই কো?

—কে হিসেব রাখছে? তোর হিসেব তোর কাছে বলাই! তবে আমি বলছিলাম—

—কি সুধীর দা?

—পঞ্চাশটা টাকা তুই আসছে মাস থেকে বাড়িয়ে দিস বলাই। আমারে তুই আড়াইশো' করে টাকা দে!

কথা না বলে চেয়ে থাকে বলাই। কথা কইতে গিয়ে সুধীরের মুখটা লাল হয়ে যায়। এই যে এই সব কথা তাকে বলতে হচ্ছে বলাইকে—সেই তো যথেষ্ট অপ্রীতিকর। আবার বলাই কেমন করে তাকে অপমান করছে দেখ! কথা না কয়ে। চোখ সরু করে চেয়ে থেকে। সুধীর আরো লাল হয়ে বলে

—তা ছাড়া, তোমার ওপর বাবু আমি একটু রাগ হইছি।

—কেন সুধীর দা?

যেন দুই শিকারীর খেলা! এ ওকে তাক করছে। দেখছে ও কি

বলে। সুধীর এবার সরু একটা উখো দিয়ে স্ক্রু ড্রাইভারের মাথাটা ঘষ্‌তে থাকে। লোহা গরম হয়। আঙুল পুড়ে ওঠে। সুধীর বলে

—তোমারে আমি যেতে বললাম একবার! তা সেই যে তুমি একবার ট্যাক্সি দেখিয়ে চলে এলে আর গেলে কই? না বলাই, বড় পরপর ভাব হয়েছে তোমার! বল, আগে কি তোমারে আমার এত কথা বলতে হতো?

আশা আনন্দে বলাইয়ের বুক ধুকপুক করে। তবে সেইটে আসল কথা? সে যায়নি, সুধীরদা ডেকেছিল তবু যায় নি—তাতেই কি রাগ করেছে সুধীর দা? পুরোন দিনের মতো যোগসম্বন্ধ নেই দু'জনে, তাতেই দুঃখু পেয়েছে সুধীর দা? তাই যদি হবে তো সেই কথা-ই বলুক না কেন সুধীর দা? এই এখানে বসে নাকে খত্‌ দিয়ে যাচ্ছে বলাই! বলাই-ও তো চায়না সুধীরদার থেকে এমনি ধারা দূর দূর হয়ে থাকতে। আর বিজলী? বলাই কবুল খাচ্ছে যে বিজলী-র ওপর তার এতটুকু রাগ নেই।

ঢোক চিপে বলাই বলে।

—হ্যাঁ সুধীর দা, সেইজন্যে রাগ করছো তুমি? বল? যেতে পারিনা কেন সে তো তুমি জান—তা তুমি যদি বল সুধীর দা!

—আমার বে' করা পরিবার, তার ঝদি মনে হয় যে, হ্যাঁ বলাই তারে ভাল চোখে দেখে না!

এত কথা উঠলো কোথা থেকে? ভেবে পায় না বলাই। মনে ভাবে, ও মেয়েমানুষের তো মতি গতির স্থির নেই! নিজেই নানান কথা ভাবে, আর নিজের দোষ ঢাকতে আর সকলের দোষ দেয়। মনে কি ভেবে নিয়ে হেসে বলাই বলে।

—যাবো সুধীরদা। যাবো কিন্তু পরিবার নে। তোমার বাসায় যাবে বলে বৌ আশা করে রয়েছে!

—ছেলেদুটোরেও এনো!

—তা ত' আনতেই হবে। বলে গাছে কেমন ফল! মা কি ছেলেকে ছেড়ে আসবে?

দু'জনে একটু চুপচাপ থাকে। তারপর উঠে আসে বলাই।

শেডের পাশ থেকে ছাঁৎকরে ছায়ার মতো সরে আসে ওয়েল্ডিং মিস্তিরি গঙ্গা। বলে

—বলাই, হিংসে হয়েছে সুধীর বাবুর, জানলি?

—কেন?

—ট্যাক্সি করে পয়সা কামাচ্ছিস দেদার, তা হিংসে হবে না?

—হ্যাঁ, এতবড় কারবার যার, সে আমার মতো চুণোপুঁটিকে করবে হিংসে?

—তোর মতো ট্যাক্সি পারমিট একখানা বের করুক দিখিনি?

—ঝুটো কথা বলো না গঙ্গাদাদা! ফিস্টের লিষ্টি বানাতে হবে এখন। বসে যাও বলাইদা! চাঁদা ধরিছি পঞ্চাশ টাকা, জানলে?

—ওঃ, টাকার গাছ পেয়েছে আমায়?

—তোমার নিজের একখানা ট্যাক্সি মানে সে তো টাকার গাছের-ই সামিল হলো বলাই-দা!

ফিস্টের লিস্ট তৈরী করে মানিক, জ্ঞান, আর গঙ্গা।

ওদিকে সুধীর গিয়ে বিজলীকে বললো—কি যে মিছে বাজে কথা বক! বলাই তেমন ছেলে নয়। এই তো আসবে এবার বৌ নিয়ে!

—আচ্ছা।

—খাতির যত্ন কোর। বৌটা ভারী ছেলেমানুষ।

—দেখতে কেমন?

—তা জানিনা বাবু।

ভোমরা আর যা হোক কায়দা তস্নিবৎ জানে। সুন্দর সেজে গুজে নেয়। ছাপার কাপড় পরে। ছেলেদের সাজিয়ে

নেয়। হাল্‌কা সাজে সহজ ও সুন্দর। এই রকমই এখন চলছে।

আর বিজলী ও আজ গা ধুয়ে এসে, প্রথমটা একগা গহনা পরে সেজেছিল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেন তার ভয় হলো। মনে হলো আয়নায় যেন এ তার ছায়া নয়—অন্য কারো ছায়া পড়েছে। সবটাই বিভ্রম—কিন্তু আয়নাতে যদি তাকে আড়াল করে আর কারো ছায়া পড়ে—ভাবতেই শিউরে উঠলো বিজলী একবার।

তার দুটোমন আছে। আর একটা মন বললো, কেন, ভালই তো। দেখা যেতো তাহ'লে কেমন মানুষটা ছিল।

শুনেছে ছিম-ছাম, সাদামাটা গেঁয়ো ধরণের। ঠিক যে সেই কথা মনে করে তা-ও নয়, খানিকটা নতুনধরণের জন্যে-ও বটে—বিজলী জাঁকজমকের সব গয়নাগুলো খুলে ফেলে সাদামাটা পোষাক করলো।

বলাই-রা আসবে বলে সে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ দালানে যেন একটা ছায়া নড়ে উঠলো। এগিয়ে ঘরের আলোয় এলো কালীচরণ।

একলা বাড়ীতে, আঁচলে চাবি বাঁধা—বাপকে কেমন ভয় করে বিজলীর। মনে হয় এখনি বাপ চাইবে টাকা, আর সে কোনমতে না করতে পারবে না। কালীচরণ সম্পর্কে তার শিশুমনে যে মারধোরের ভয় দানাবেঁধে রয়েছে, এখনো সেটা বিজলীকে কষ্ট দেয়। সে বললো

—বাবা, কখন এসেছ গো? ডাকনি তো?

—কেন, দালানে বেশ হাওয়া দিচ্ছিল না? বসিছিলাম। তা সুধীর তো তোকে অনেক গায়ে গয়না দিয়েছে রে! ভাল ভাল। তোর সুখ দেখেই আমি সুখী, জানলি বিজলী?

খিসখিসে গলায় কথা বলে ফ্যানের বাতাস বাঁচিয়ে কালীচরণ বিড়ি ধরালো। বিড়িটায় সুখটান দিতে কিছুক্ষণ গেল। ঘরের কোনে নেংটি ইঁদুর কাঠ কাটছে কুরকুর করে। তার একটা শব্দ চলেছে। বিজলীর মনে হয়, এই যে ঘণ্টা মিনিট ধরে সময় যাচ্ছে। তারই শব্দ ওটা।

ওইরকম কিঁচকিঁচ করে সূক্ষ্ম একটা র‍্যাঁদা চালাবার শব্দ করে কাটছে সময়। কালীচরণ আবার বলে,

—সুধীর এখন খুব পয়সা করছে, তাই না রে? কালীচরণের চোখটা খাটের নিচে ঘুরে যায়। হাঁড়িতে মিষ্টি আর চ্যাঙারীতে খাবার আনিয়ে রেখেছে বিজলী। কুঁজোতে জল আর গোটাকয় গেলাস ও সাজিয়ে রেখেছে। বিজলী বলে

—ঐ খাবার? একজনদের আসবার কথা আছে।

—না, না—খাবারের কথা কে বলছে?

কালীচরণ নেবা বিড়ির ছাই ঝাড়তে গিয়ে একটা হাত নেড়ে বাজে ছুটো কথা ভাড়িয়ে দেবার ভঙ্গী করে। বলে

—নিশ্চয় পয়সা হয়েছে—এই ঝে শুনলাম বলাই মিস্তিরিকে টাকা দিয়ে ট্যাক্সি কিনে দিয়েছে?

বিজলীর দুঃখের জায়গায় ঘা লাগে। তবু এটুকু সাধারণ জ্ঞান তার হয়, যে সুধীরের বিপক্ষে কথা কইলে নিজেই জড়িয়ে পড়বে বিজলী। কালীচরণের মাথায় যদি একবার বুদ্ধি চাপে, আর একবার সে পয়সা-র প্রতিশ্রুতি পায়—এই কালীচরণ-ই এমন হয়ে উঠবে, যে তাকে আর ঠেকানো যাবে না। কালীচরণের লোভটা সাপের মতো। ঠাণ্ডা, মৃত্যুবাহী, নিঃশব্দে ঢোকে ঘরে। আর সময় বুঝে সে লোভ একটা দুটো নয় হাজারটা মাথা তুলতে জানে। বিজলীর মনে অনেকগুলো ঘটনার স্মৃতি বিশ্রী কালোরঙে আঁকা রয়েছে। বিজলী তাই আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বলে

—না—বলাই মিস্তিরি-র পারমিট সব নিজের—সব নিজের। বাবু শুধু টাকা ধার দিয়েছে বই তো নয়? তা-ও লেখাপড়া করে।

—হ্যাঃ ধার দিয়েছে—শুধ্‌ছে ধার বলাই?

—হ্যাঁ বাবা—দফে দফে আমিই ঝে কত টাকা রাখনু সিন্দুকে।

—অ!

ব'লে কালীচরণ ঈষৎ গাঁজার ধোঁয়ায় লাল চোখ আর কাঁপা হাতে—বিড়িটা আবার ধরাবার জটিল প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে

—অমনি টাকা ধার দে' সুবলরে কেন ট্যাক্সি করে দেয়না সুধীর? সুবল তাহ'লে আর ভগ্নীপোতের হ্যানস্তার ভাত খায় নাকো! আর কি জানিস্? একখানা ট্যাক্সি থাকলে আমি আর সুবল-ও ঝা করে হোক চালিয়ে দিই। সুধীরকে-ও জ্বালাতন করি না।

—ট্যাক্সি কি অমনি হয়? বলাইরে খুব ভাল বেসেছে কোন্ সায়েব—সেই দিয়েছে চেষ্টা চরিত্র করে। বড়দরের মিস্তিরী তো!

নেহাৎ নিজের সর্বনাশ ঠেকাতে বলাইয়ের পক্ষ টেনে এতগুলো কথা বলতে হয় বিজলীকে। কালীচরণ এবার উঠে পড়ে। বলে

—তা ভাল, তা ভাল! তবে ছেলে বুঝোসনি বিজলী! সুধীরের চেষ্টা ছিল না—অমনি অমনি সায়েব বলাই-রে পারমিট দিলে! কি আছে কি বলাইয়ের? না চাল, না চুলো! সুধীর এখন সুবলরে সে চোক্ষে দেখে না—না কি আমারে-ই বিশ্বাস পায় না! যাক্ গে—না দেছে তো কি হয়েছে! এখন ঝদি সুবল কাজ কর্ম শিখে নেয়! তুই এক কাজ কর—তুই আমারে দশটা টাকা দে। আমি চলে যাই।

কাল সুধীরের কাছ থেকে কারখানায় গিয়ে পঞ্চাশটা টাকা নিয়েছে কালীচরণ, আজ আবার দশটা টাকা? ঘেন্নায় বিজলীর নিজের ওপর রাগ হয়। বিনা প্রতিবাদে সে হাতবাক্স থেকে দেয় দশটা টাকা। কালীচরণ চলে যেতে নেয়। নিচে নেমে যায়। আঁধারে এমন চলতে-ও জানে মানুষটা। পা পিছলে যায়না, বা সিঁড়ি ফসকে যায় না তো?

এত কথা বলে কালীচরণ, কিন্তু এ কথা একবার-ও বলেনা যে—বিজলী, চল্ তোর মায়ের কাছে, ক'দিন জুড়োবি। তেমন কপাল করেনি বিজলী। তাই সে এ কথা বাপকে কোন-দিন-ও বলতে পারেনা

যে তোমাদের জামাই আমাকে-ও বিশ্বাস পায় না গো! আমি যা যা ভেবেছিলাম, তার কিছুই পাইনি কো। গয়না টাকায় আমার সুখ হয়নি। শুধু খেলে পরলে আর টকি দেখলেই সুখ হবে বলে যে আশা করিছিলাম, সে আশা আমার আর নেই। সবই হয়ে গিয়েছে অন্য রকম। অপর সব কথা ছেড়েই-দি, আমি যে ভেবেছিলাম সুবলরে আমি তোমাদের সঙ্গ ছাড়িয়ে এনে মানুষ করে দোব। তা হলো না। সে-ও তোমার মতন। নয় নরম সরম স্বভাব!—বোকা বয়াটে ছেলে—কিন্তু ভগ্নীপোত তার কাছে-ও এক টাকার ঝুলি। ঝাড়লেই টাকা পড়বে ঝপঝপিয়ে।

আর অন্য মেয়েরা যেমন তেমন যে বাপের বাড়ী গে' জুড়িয়ে আসে, তা ত হবেনি। আমার মা বাপের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে। যেই গে' নামবো—অমনিই বাপ খরচ চাইতে সুরু করবে। বলবে—নোটের ভাঙানি নেই কো—দে বিজলী একটা টাকা, তোরে মিষ্টি এনে দিই—দে চারটে টাকা তোরে মাছ এনে দিই।

সে এমন বিচ্ছিরি—যে তার চেয়ে না গিয়ে সুখে আছি আমি। সুখের চে' স্বস্তি ভাল।

বিজলী এবার অনেকগুলো গলার শব্দ শোনে। বুঝি আসছে ওরা। চোখটা মুছে পাউডার মেখে নেয়। ও কি, নিচে কালীচরণের গলা না? নিচে কি করছিল কালীচরণ? সন্দিগ্ধ মনটা নিচের ঘরখানায় চোখ বুলিয়ে নেয়। না, নিচে কোন দামী জিনিষ নেই। ঘড়িটা আস্‌টা পেলে টপ্‌ করে তুলে পকেটে পোরা আশ্চর্য নয় কালীচরণের পক্ষে। ভেবে যেন বিজলীর গা হিম হয়ে আসে। কোন প্রলোভন ছাড়া এমনিই যে মানুষটা আঁধারে অমন ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাকে ভয় করে না? শোনে জানলায় গাল চেপে ধরে। তার বাপ বলছে—মেয়েটাকে দেখতে ছুটে ছুটে আসি, থাকতে পারিনা। বাপের প্রাণ তো? তা বাবা সুধীর, দেখলুম

বিজলী মা-র মুখখানা যেন শুকিয়ে গিয়েছে। ওর মা-ও বলছিল, একবার যদি পাঠিয়ে দিতে। অনেকদিন যায়নি কো!

—গেলেই তো পারে! বলবো খ'ন!

—তোমাকে-ও যেতে হবে বাবা—ছাড়ব না—তোমার শাশুড়ী ঝে কতদুঃখু করেছে—

—সময় হলেই যাব, সময় হয় না কো!

উঠে আসে ওরা! আর হেসে এগিয়ে যায় বিজলী! বলে—এসো ভাই এসো!

শুধু ভোমরা নয় বলাই আর সুধীর—ও যেন একটু চমকে যায়। বলাইয়ের কাছে ভোমরা শুনে শুনে মনে ধারণা করেছে, সেই বাঁধা গতের গল্প। ভাল বৌ-টা দুঃখু কষ্ট করে মরে গিয়েছে। এখন যে এসেছে, সে অতএব, খারাপ বৌ। যে চলে গিয়েছে তার সকলই ভাল ছিল। আর যে রয়েছে তার সকলই খারাপ। সে শাখাসিঁদুরে খুসী থাকতো আর এ গয়না কাপড় কিনে ফতুর করে দিচ্ছে সুধীরকে।

কিন্তু সুয়ো বৌ আর দুয়ো বৌ-এর সে উপাখ্যান মিলছে কোথায়? দিব্যি গেরস্ত বৌ-এর মতো লক্ষ্মী শ্রী বিজলীর মধ্যে দেখে ভোমরা। আর তাকে বসিয়ে—সকলকে আপ্যায়ন করে খাবার সাজায় বিজলী প্লেটে। বলে

—ছেলেটি এমন রোগা কেন ভাই?

—দেখুন না—কত ওষুধ বিষুধ কত চিকিচ্ছে—কিছুতে সারছেনা ছেলে।

চোখ টেনে গলার সুর ভারিক্কে ক'রে বলে ভোমরা।

খাবার দিয়ে চা ক'রে দিয়ে বিজলী ভোমরাকে বাড়ী দেখায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। রান্নাঘর উঠোন—উঠোনে গুদামঘর একটা লোহালক্কড় ভর্তি। ভোমরা অনেক কথা বলে। বিজলীর ঝোঁক কিসে? কি করে

সারাটাদিন ? সেলাই ফোঁড়াই-য়ে ঝোঁক আছে কি ? ভোমরার নিজের আবার কুরুস কাঁটার কাজে বড্ড শখ ! এমনি সব কথা !

সব জবাব দিতে পারে না বিজলী ! বলে—না ভাই সেলাই অত জানিনি ! আমার মায়ের অবিশ্যি শখ আছে ! এককালে করেছে উলের কাজ, আঁশ দে সাজি ! আমার ও সব নেই কো !

ভোমরা বেশ ঝিলিক দিয়ে দিয়ে কথা কয়। শুনতে শুনতে নিজেকে যেন বিজলীর বড়ই স্থূল আর অপটু বলে মনে হয়। আরো মনে হয় এই মেয়েটি যেন তাকে সদাসর্বদা তুলনা করে দেখছে। ভোমরা যে বলাইয়ের বৌ ! বলাই নিশ্চয়ই নিজের অবিশ্বাস খানিকটা ভোমরার মধ্যে-ও সঞ্চার করেছে !

কথাবার্ত্তা কয়ে বিদায় নিতে নিতে রাত ন-টা বেজে যায় ! একদিন আসবেন দিদি ! নিশ্চয় আসবেন। ভুলবেন না !

—যাব বই কি ! নিশ্চয় যাব !

ভোমরা আর বলাই চলে গেলে পরে হঠাৎ আজ বিজলীর নিজেকে বড্ড ফাঁকা মনে হয়। মনে হয় ঘরে-দোরে কিছু নেই আকর্ষণের। হঠাৎ ক'রে আজ সুধীরের সঙ্গে দুটো কথা কইতে সাধ যায়। স্বামীকে আজ বিজলী অনেকদিন বাদে বলে

—এখন আবার খাতাপত্তর নিয়ে বসলে ? আগে হাতমুখ ধুয়ে একটু এমনি ব'সো না ? খেতে দিই আগে !

—আমাকে ? কেন ?

—তোমাকে নয় তো কাকে ?

বিজলী হেসে সহজ হতে চায়। কিন্তু সুধীর বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ে। বলে

—না বৌ, তোমার কষ্ট হবে ! তুমি খেয়ে দেয়ে যেমন চাপা দিয়ে ঢেকে রাখো...তাই রেখে শুয়ে প'ড়ো !

আর কথা বাড়ায় না বিজলী। রান্নাঘরে এসে নিজের ভাতে জল

ঢেলে দেয়। সুবল আর সুধীরের খাবার বেড়ে রেখে ঢাকনী চাপা দেয়।

সুধীর একমনে হিসেব দেখে। বিজলী আবার নির্লজ্জের মতো কাঙাল সুরে বলে

—ঘরে এসে এতটুকু থাকো না...একটা কথা ক শুনো, আমার এমন ভাললাগে ? বল ? সারাদিন একলা একলা !

সুধীর অপ্রতিভ সুরে বলে...তাই তো !

তারপর কি ভেবে বলে তোমার বাবার সঙ্গে আসবার টাইমে দেখা হলো। তিনি বলছিলেন যাবার কথা। নয় ক'দিন ঘুরে এসো !

সুধারের গলার এই সুরে বিজলী এ বাড়ীতে তার ঠাঁই কোথায় সেটা যেন বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে- বিজলীর সম্পর্কে সুধীরের যা আছে সেটা অনেকাংশেই সংশয় আর অবিশ্বাস। বুঝতে পারে, যে বিয়ে করে এনে সুধীর তাকে আর সব দিয়েছে। তবে ভালবাসা দেয়নি এতটুকু। আজ যদি সে এখনি বাপের বাড়ী চলে যায়, তাতে সুধীরের এতটুকু ফাঁকা হয়ে যাবে না। বরঞ্চ মানুষটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে।

এর আগে এই কথাটা যতবার সে বুঝেছে, ততবারেই বিজলী রাগ ও নিস্ফল ক্ষোভে জ্বলে উঠেছে। বর্বর হয়ে সুধীরকে আঘাত দিতে চেয়েছে। নিজের জ্ঞাতি গুষ্টী ডেকে এনে বাড়ী বোঝাই করে খাওয়া দাওয়া করেছে, নিজে ঘর ছেড়ে সুখের সন্ধানে সিনেমা থিয়েটারে ঘুরে মরেছে। কিন্তু তাতে সুধীরের মনে আঘাত দিতে পারেনি। নিজেই ঘা খেয়েছে বেশী। মানুষ জেনেছে দোজপক্ষের বৌ এই বিজলী একটা ভীষণ মেয়ে স্বার্থপর, লোভী, বর্বর !

আজ আর বিজলী জ্বলে ওঠে না। সকরুণ হতাশায় একটু চেয়ে থাকে। তারপর বলে

—বেশ তো, যখন ইচ্ছে হবে, তা-ই যাব !

সুধীর তার কাজে ডুবে যায়। খাতাপত্র থেকে বলাইয়ের দস্তখতী কাগজটা চোখের সামনে তুলে এই ভাবতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যে বলাই কি এতটাকা করছে, যে এর মধ্যেই চাকচিক্য এসে গিয়েছে বলাই আর তার বৌ-এর চেহারায় ? সুধীর এইসব আবোল তাবোল কথা এত মন দিয়ে ভাবে, যে লক্ষ্য-ও করে না কখন বিজলী ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গিয়েছে। একথা সে ভাবতে পারে না, যে বিজলী পাশের আঁধার ঘরে জানলার গরাদ ধরে আঁধারের দিকে চেয়ে আছে। জানতে পারে না, যে বিজলীর কুশ্রী মুখখানার সকল পাউডার স্নো ধুয়ে টপটপ ক'রে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জলের ধারা।

যার ঘরে দোরে এত সুখের বন্দোবস্ত, সেই বিজলীর মনে-ও যে দুঃখ হয়, তা দেখলে বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে যেতো সুধীর। আশ্চর্য হয়ে যেতো, আর যে নির্বোধ মনটা খালি খালি শান্তিলতার সঙ্গে বিজলীর তুলনা করে, সে মনটা বিজলীর প্রতি একটু নরম হতো।

॥ নয় ॥

হায়ার পারচেঞ্জ সিষ্টেমে শেষ অবধি কিছু বেশী-ই পড়ে যায় খরচা। কোম্পানীর সাড়ে তিনশো আর সুধীরের আড়াই-শো দিয়ে মাসে মাসে তার হাতে আসছে কত? আড়াইশো, তিনশো, বা চার শো।

তার বাড়ীর মেঝেতে গর্ত হয়ে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। খোলার চালে জল পড়ে। মিস্তিরী না লাগালে আর চলছে না। এতদিন বা যেমন তেমন করে কেটেছে। এখন মা বলে, বৌ বলে,—ভাঙ্গাঘরে শুতে পারিনে আর।

বলাইয়ের মনমেজাজ খারাপ থাকলে বলে—যত রাজ্যের মেয়েমানুষী ঝামেলা।

বলে বটে। কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে দেখে দেখে বোঝে, আর একটা বর্ষার জল খেলে ঘরটা ভেঙে চুরে পড়া বিচিত্র নয়। ঘর তাকে সারাতেই হবে।

মঙ্গল মিস্তিরি চাল, দেয়াল মেঝে—সব দেখে পনের শ' টাকার হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যায়। বলে…দেড়হাজার টাকা খরচা কর্…আমি মনখুশী করে কাজ করে যাই।

একদমে দেড়হাজার টাকা বের করতে পারে সে, এই ভাবছে নাকি তার সম্পর্কে সবাই? বলাই বলে

—আগে মঙ্গলকাকা তুমি আমার চালাখানার ব্যবস্থা করে দাও। তারপরে আমি ধীরে আস্তে সারব খ'ন। যে মাসে যেমন পারব।

আর এই দিনকালে ভোমরা-ও যেন একটু সুখচেনা মানুষ হলো।

এতকাল ভাড়াঘরে স্বামীর বুকের কাছে মাথা রেখে, আবদার কাড়িয়ে গল্পগাছা শুনে রাত কেটে গিয়েছে তার। এখন যেন আর তাতে মন ওঠে না। ভোমরা এক একদিন বলে

—আর যেন বয়না গো শরীরে! একটা ঠিকে লোক রাখবে?

কোনদিন জানলায় হাত রেখে জজবাড়ীর ফর্সা বৌ-য়ের গেরস্থালী ঘাড় উলটে উলটে দেখে। বলে

—অমনি একটা স্টোভ হয়, তো ঝাঁ করে চা দুধ ফুটিয়ে নিই। এ বেলা আঁচ না জ্বাললে-ও চলে যায়।

বলাই কাকুতি মিনতি করে। বলে…বৌ ধৈর্য ধরে থাক। আর কয়মাস কষ্ট কর। ধারদেনা শুধে দিই। দেনা না দিতে পারলে গাড়ী রাখতে পারবো না।

আর সকলের দেরী সয় তো সুধীরের সয়না। সুধীরের মনটা যে কি একরকমের হয়েছে! চারহাজার টাকা ধরে দিয়ে সে ঠকে গিয়েছে আর বলাই মস্ত লাভ করেছে…এই চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মনের এই হিংসে ভাবটি ঢেকে রাখবার জন্যে সুধীর বড়ই তৎপর। কিন্তু মনের ভাব অমন ঢেকে রাখা চলে কি? এবার সুধীর পষ্ট বলে বসলো বিজলীকে

—অন্য জায়গায় হলে আমাকে এর পরে সুদ দিতো। কাবলীর ঠেঙে টাকা নিলে বলাই-এর সুদ শুধতে জন্ম কাল কেটে যেত।

বিজলী সুধীরের কাছে হঠাৎ খোলামেলা একটা মনের কথা বলে বসলো। বললো

—দিয়েছ…তুমিও তাকে ভালবাস। এখন আর আফশোষ করোনা বাবু!

বলাই-এর সঙ্গে দেখা হতে বিজলী সরল ভাবেই আন্তরিক হতে চাইলো। বললো সব। তারপর বললো

—তোমার দাদা যেন আফশোষ করছে গো! বলাই এর মেজাজ চড়ে গেল। বললো

—কাবলীর ঠেঙে তো নিইনি টাকা! সুদের লোভ মনে রয়েছে তো নিলেই পারতো সুদ! লেখাপড়ার সময় মনে ছিল না?

পরের মাসে পয়লা তারিখেই টাকা দিয়ে গেল বলাই! তাতে-ও খুসী হলো না সুধীর। বলে বেড়ালো

—বড্ড বাড় বেড়েছে বলাইয়ের। টাকার গরম দেখাচ্ছে।

কেমন যেন জড়িয়ে গেল বলাই! অনেক ইচ্ছে থাকা সত্বে-ও ঠিকমতো সুধীরের গ্যারেজে যেতে পারলো না। নিজের গাড়ী মেরামত করতে গেল অবশ্য। তখন সুধীর-ও শোনাল তাকে—এমন ত কথা ছিল না। হ্যাঁ বলাই? ভালভাল মেরামতের কাজ ছুটে চলে যাচ্ছে ঐ রুবি কোম্পানীতে?

—চেষ্টা করি সুধীরদা, পারি কোথায়? দেখছ না? কি রকম আটকে রইছি?

—অ!

বলে গুম হয়ে রইল সুধীর। তবে ল্যান্সডাউন রোডে আটনম্বর ষ্টেটবাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে মাডগার্ড তুবড়ে, ফুটবোর্ড ভেঙে যেদিন গ্যারেজে গাড়ী নিয়ে গেল বলাই—সামনে এলনা সুধীর। দেখা করল না।

সুবলের হাতে বিলের টাকা দিয়ে বলাই চলে এলো মনখারাপ করে। ভোমরা বললো—অমন মনমরা হয়ে রয়েছ কেন? কি হয়েছে? —গুমরে বেড়াচ্ছ?

—কিছু না! তুই চুপ কর।

—ইস্, তোমার মুখ দেখে আমি মনের কথা জানতে পারি, জানলে?

—তো চুপ করে থাক্।

এমনি সময় বিজলী বেড়াতে এল তাদের বাড়ী। দুপুর বেলা।

ছেলেদের জন্যে মিষ্টি হাতে। ভোমরার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ঘর দোর বেশ করে চেয়ে দেখলো। তারপর ঘরে ফিরে এসে, সাদামনের মানুষের সোজাবুদ্ধিতে বললো সুধীরকে

—দেখে এলাম বলাইয়ের বাড়ী। তুমি যে দিবারাত্তির তার টাকা কড়ির কথা ভাবছো তেমন কিছু নয়।

—হ্যাঁ! তোমাকে দেখিয়ে সব ছড়িয়ে রেখে দেবে খ'ন।

—তা হবে! তোমাদের সাতকেলে বন্ধুত্ব। তুমি যত জান, আমি কি তত জানি?

মুচকি হেসে বিজলী ঘরের কাজে গেল। সুধীর বললো—বন্ধুত্ব কিসের? কড়ি ফেলিছি তেল মেখিছি। তারে ঠকাইনি কোন দিন-ও!

সুধীরের মনে বলাইয়ের উপর রাগ জন্মাতে না বিজলীর কত চেষ্টা ছিল! কিন্তু আজ কেন বিজলীর ভাল লাগে না? একটা ছেলেমানুষ বৌ, যে প্ল্যাষ্টিক কাঁচের জিনিষে বাহার দিয়ে গর্ব দেখায়, তার ছেলেমানুষীটা মনে পড়ে। দুটি শিশুর কলকাকলী মনে পড়ে। বলাইয়ের মা কাছে এসে কেমন গায়ে হাত সাপটে তাকে আশীর্বাদ করলো

—তুমি মা রাজরাণী হও! টাকা ধার দে' ঝা উব্‌গারটা করলে!
—সেই স্নেহের ভঙ্গীটা মনে পড়ে। বিজলীর হিংসে হয় না। সমবেদনা হয়। বলাই সেদিন এসেছিল টাকা দিতে। কণ্ঠার হাড় বেরোন চোখের নীচে কালি, আর চিরকেলে বেয়াড়া গোঁয়ার ভাবটা আরো পরিস্ফুট। মনে পড়ে বিজলীর কেমন যেন লাগে। অশিক্ষিত বিজলী বুঝতে পারে না। যে সেটা হলো সমবেদনা। বিজলীর বুকের মধ্যে একটা তেষ্টা তোলপাড় করে। মনে হয় অদ্ভুত সব কথা। মনে হয় তার সংসারটা যদি অমন হতো? যে সংসারে সুধীর বিজলীকে অবিশ্বাস করে না! এমন গয়নাটাকার ঘুঁষ দেয় না! বৌ-এর মতো সুখে দুঃখে ভালবাসে!

যে সংসারে কালীবাবু-র লোভলালসা উঁকি ঝুঁকি মারে না। যে সংসারে সুবল বোন ভগ্নীপতিকে এমন টাকা দেবার গৌরীসেন মনে করেনা…সত্যি ভালবাসে! সেই সংসারে অমন একটি ছুটি শিশু নিয়ে সুখে থাকতে পারে বিজলী।

কিন্তু তা কি হয়? তা হয় না। বিজলীর কপালে পাশার দান গিয়েছে উল্টে। সুধীরকে যদি কোন কথা কইতে চা'য় বিজলী—প্রথমে ঝগড়া হবে। তারপর সুধীর তাবিজ, বাজু বা কানবালা-র ঘুঁষ দেবে। কেন? সোনা-বেচা-কেনা কালীবাবুর মেয়ে বলে তার-ও সুখশান্তি কি-ঐ সোনার গহনাতেই? আর কিছু সে চেনে না?

চোখের জল মুছে বিজলী নতুন নতুন ফন্দীর কথা ভাবে। ঐ সুধীরকে তার জব্দ করতে হবে।

এমনি করে কাটলো একটা বছর। দোসরা বছরে পড়বার মুখে বড় টাল গেল একটা। অফিস টাইম। শেয়লদ' বৌ-বাজারের মোড়ে এক সিমেণ্টের বস্তা বোঝাই লরীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ট্যাক্সি গিয়ে পড়লো ফুটপাথে। ভয় খেয়ে তারই মধ্যে টপকে নামতে গিয়ে প্যাসেঞ্জার দারুণ আহত হলো। বলাই নিজে সর্বশরীর ভাঙা কাঁচের টুকরো ঢুকিয়ে ক্ষতবিক্ষত হলো। হাঁসপাতালে গেল বলাই। গাড়ী গেল গ্যারেজে। তা-ও নিজে হেঁটে চলে যেতে পারলোনা গাড়ী। অন্য লরী তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেল।

নিজে যদি বা রিলিজ সার্টিফিকেট দিয়ে বেরুল, গাড়ি আর ছাড় পায়না। একমাসে বিশ দিন বসে থাকতে হলো। মাথায় বাজ পড়লো মাসের শেষে। মোটর কোম্পানীর ধার শুধে এ মাসের দশ তারিখে একশোটি টাকা নিয়ে সুধীরের কাছে গেল বলাই। কারখানার ছোট ঘরে বসে হিসেব দেখছিলো সুধীর। টাকা দেখে চুপ করে রইলো। বলাইয়ের দিকে চেয়ে রইলো নিস্পলক ঠাণ্ডা চোখে। অস্বস্তি আর ভয় বোধ করলো বলাই। সুধীর বললো

—বলাই, তুই আর দুটো দিক টানতে পারছিস না। তাই নয় ?

—এ কথা বলছো কেন সুধীরদা ?

—ট্যাক্সি তুই আমারে ছেড়ে দে' বলাই।

—সুধীরদা ?

—তোকে টাকা ধার দে' আমি আটকে গেছি বলাই। আমি তোকে ভাল বুদ্ধি দিই। শোন্ তুই। ফিফ্‌টিন পারসেণ্টে চালাবি তুই। কোম্পানীর টাকা-ও আমি শুধে দোব। আমার ধার মিটিয়ে নিয়ে গাড়ী আমি ছেড়ে দেব।

বলাইয়ের ঘাড় দিয়ে কতকগুলো বরফের টুকরো যেন উঠছে আর নামছে। সুধীরের গলা যেমন ঠাণ্ডা তেমনই নিচু। বলে—এবারকার রিপেয়ার খরচা দুশো আমি ছেড়ে দোব।

—তোমার এতবড় কারখানা সুধীরদা। আমার মতো পঞ্চাশটা মানুষকে পুষছো তুমি। আমার গাড়ীখানার ওপর টাঁক করোনা। একবছর ট্যাক্সি চালাচ্ছি তা ব'লে তো লাখ পঞ্চাশ করিনি ? যে ঝটপট দুশো পাঁচশো শুধে দোব ?

—তোর সঙ্গে কারখানার লক্ষ্মী গিয়েছে বলাই। সরকারী ওয়ার্কশপ-গুলো হয়ে গভরমেণ্ট কণ্ট্রাক্ট আমার ছুটে গেল। সরকারের যাবতীয় গাড়ী সেরেছি এককালে।

—তোমার টাকা আমি শুধবো সুধীরদা। আর তিনটে মাস একটু সবুর কর।

—তোর গাড়ি নয় তোর থাকতো। ধার দেনা শুধে প'স্কের হয়ে যেতিস ?

শুনে-ও না শোনার ভাণ করে বেরিয়ে এলো বলাই। মনে হলো ট্যাক্সিটা তার দাঁড়িয়ে আছে শত্রুপুরীতে। বের করে নিয়ে না এলে পরে ঐ সুধীরের লোভ তাকে স্পর্শ করবে।

বেরিয়ে হাজরা গরছার মোড়ের সামনে প্যাসেঞ্জার। দুটো পুরুষ।

চাকর বাকর শ্রেণীর। চোয়াড়ে কালো চেহারা। ব্যাকব্রাশ কালো চুল। একটা বছর সাতেকের ছেলে। চমৎকার ফর্সা, ভাল জামা প্যান্ট পরা। বাবুদের ছেলে যেমন হতে হয়। গাড়ীতে চেপে বসে একজন বলে—টেরিটি বাজার। হাঁকিয়ে।

ছেলেটা বলে—সত্য, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্ তুই আমাকে? আমার বাবা মা এসে খুঁজবে?

—চল না চল। সেই যে খরগোস, কুকুর, পাখী, মাছ? সব দেবো তোমায়।

—কিন্তু এখন যে রাত্তির। আমার যে ভয় করছে।

ভয় কি? বাবা মা সিনেমা দেখে এসে বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতে আমরা ও ফিরে আসব খ'ন। জানলে?

তবু ছেলেটা কেঁদে ওঠে। আর একজন যেন নিচু গলায় গালি দিয়ে বলে—তোকে বললুম সত্য যে ডাগর ছেলের ঝামেলা বেশী। এখন দেখ্। কি খোকাবাবু—লজেন্স খাবে?

—না। আমি বাড়ী যাবো।

—নিশ্চয়।

—বলে আর বেশী জোয়ান যে লোকটা সে উঠে এসে বলাইকে কাঁধের পাশ দিয়ে পাঁচ টাকার নোট ঠেলে দেয়। বলাইয়ের ঘাড় সিরসির করে। আজ সঙ্গে কেউ নেই। সে একা।

ল্যান্সডাউন বাজার ছাড়িয়ে এসে হঠাৎ গাড়ীর গতি কমায় বলাই। তারপর চোখকান বুজে ডানপাশটা ঠাওর করে ট্যাক্সি ঢুকিয়ে দেয় ডানদিকে। প্যাসেঞ্জারের থাবা তার কাঁধে পড়তে না পড়তে বেলতলা থানা মোটর ভেহিকলে-র চওড়া গেটে ঢুকে যায় গাড়ি। ছুটে আসে পুলিশ।

ব্যস! বেরিয়ে পড়লো একটা চক্রান্ত। থানা থেকে বাচ্চার বাড়ীতে ফোন! বাপ মা হন্তদন্ত হয়ে এলেন! তিনবছরের বিশ্বাসী

চাকর। বাড়ীতে রেখে সিনেমায় গিয়েছিলেন তাঁরা। অফিসার তিরস্কার করলেন বাপ মা-কে।

এই কেস আরও গড়ালো। দুটো চাকরকে জেরা করে আরো বড় দলের খোঁজ পেল পুলিশ। ছেলের বাবা এসে বলাইকে একশো টাকা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন।

এখন বলাইয়ের চোখে আর অন্য কোন ছবি নেই। দাঁতে মুখে চিপে রয়েছে। আরো একবছর ঘষলে তবে গাড়ীর দেনা পুরো শোধ হবে। আরো কি, নিজে আর কতক্ষণ চালানো যায়? ভোর থেকে রাত বারোটা অবধি কি একটা মানুষ সমানে স্টিয়ারিং-য়ে বসে থাকতে পারে? অথচ ট্যাক্সি এমন জিনিস, যে যত চালাবে' তত টাকা! ক-বার অন্যান্য লোককে মাইনে করে রেখে দেখলো বলাই। তাতে পোষায় না। তার যেমন মায়া, তেমন কি অপর লোকের? তারা বড় তাড়াতাড়ি, বড় ঝাঁকি দিয়ে চালায়। বড় টাল ঠোকর খাওয়ায়। আর বলাইয়ের খ্যাচামেচির ভয়ে তার চেনাজন নিতে-ও চায় না।

ঘরেই কি কম অশান্তি? বেণুটার পা দুখানা ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে। ডাক্তার বললেন—টাকা ও তো রোজগার করছো দেদার। ছেলেটার এ হাল কেন?

তাঁর-ই ডিস্‌পেন্সারীতে বসে তিনি নাতিদীর্ঘ একখানা চমৎকার বক্তৃতা দিলেন বলাইয়ের মতো সব আরো মানুষের সম্পর্কে। বললেন—এদের বাপ হবার সখ আছে, অথচ দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে নেই। এই যে ছেলেটি—এর এখন শরীরে কি দরকার জানো? কড্‌লিভার মাখাবে। রোদ্দুরে রাখবে। কড্‌লিভার খাওয়াবে। আর সকাল থেকে রাতের মধ্যে দুধ, ছানা, মাংস, আপেল, সন্দেশ—এই সব খাওয়াবে। নিয়মিত ওজন নেবে।

কড্‌লিভারের বিজ্ঞাপনে রিকেটি ছেলের ছবি দেখিয়ে বললেন—এমনি বড় মাথা, সরু ঘাড়, প্যাঁকাটির মতো হাত পা যদি হয় তোমার

ছেলের ? ভালো লাগবে তোমার ? বলি কেন, সে রকম তো হবেই দেখাই যাচ্ছে।

—তা ঝা হয় আপনি করুন ডাক্তারবাবু। আমি কি বুঝি বলুন ?

ছেলের টনিক ওষুধ কিনে ফিরলো বলাই। কিন্তু একদিক জুড়তে আর একদিক ছিঁড়ে আসে। ভোমরা-র ইদানীং মনে হচ্ছে, বলাই তার উপর বড্ড সুবিধে নিচ্ছে। কেন, এখন সে একটু আরাম করতে পারে না ? না কি তার অধিকার নেই ? বলে

—তোমার সুধীরদাদা ঐ কালো বৌ-রে কি সুখে রেখেছে ! যেমন তেমন দুটো ফুটিয়ে দিলেই খুশী।

—তার মতো কি আমি পারি ?

ভোমরা চোখ আড় করে তাকায় ঐ লোহার সিন্ধুকের দিকে। ঐ সিন্দুকে টাকা জমাচ্ছে বলাই। কেন ? ধার দেনা শুধে বলাই যবে ঝাড়াঝাপটা হবে, তবেই কি ভোমরা-র সুখশান্তির দিকে ফিরে তাকাতে সময় হবে তার ? মনে মনে রাগ করে ভোমরা বলে

—তবে আর কি ? খাটতে এসেছি খেটে যাই।

ভোমরার রাগ হওয়া তো স্বাভাবিক। স্বচ্ছলতার এতটুকু আশ্বাস পেলেই যদি সাধকামনার অংকুর গুলো এমন করে মাথা জাগাতে চায়, তবে ভোমরা কি করে ?

সময় খারাপ পড়লে আশ্চর্য প্রলোভন আসে। একবুড়ো ভদ্রলোক বিয়ের বাজারে ট্যাক্সি নিলেন। সকাল দশটা থেকে ঘুরে ঘুরে বেলা তিনটের সময় ডালহৌসী স্কোয়ারে নেমে গেলেন। খানিকটা বার্ধক্য খানিকটা দারিদ্র ; সবশুদ্ধ মিলিয়ে খুব পরাজিত আর বিভ্রান্ত চেহারা।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ধর্মতলার হোটেলে গেল বলাই। হাতেমুখে জল দিয়ে দুটি ভাত খাবে। গাড়ির কাঁচ তুলে বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ দেখে চামড়ার একটা এ্যাটাচি। খুলে দেখে নতুন সোনার গয়না আর একশো টাকার নোট।

দেখে কান-মাথা-ঝিম-ঝিম করতে লাগলো। মনে হলো এই তো—বড়মানুষ হবার ব্যবস্থা তো করে-ই দিয়েছেন ভগবান। নিয়ে নিলেই হয়!

পারে না বলাই। ভাত খাওয়া মাথায় ওঠে। বুড়োকে বিশ্রী একটা গালাগালি দিয়ে হাতড়াতে থাকে বলাই। যদি কোন ঠিকানা পায়? গয়নার রসিদে হাবড়া কদমতলার একটা ঠিকানা পাওয়া যায়! একটা ডাব ঢকঢকিয়ে খেয়ে হাওড়ায় রওনা হয় বলাই।

ছয় বাই বাইশ বাই নয়ের বি, মনোমিত্তির লেনের জীর্ণ ইস্কুলবাড়িটায় তখন আমপাতার ঝালর শুকিয়ে এসেছে। সাড়া শব্দ নেই। বলাই কড়া নাড়তে সুন্দর মতো সিঁদুর লেপা একটি বৌ দরজা খুলে দেয়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর ডাকতে ডাকতে চলে যায় ভেতরে—ওগো! ঠাকুরঝির গয়না পাওয়া গিয়েছে গো! ও বাবা আসুন।

বাড়ীতে যত ছেলেমেয়ে বাচ্চাকাচ্চা ছিল, সবাই ছুটে এলো। সেই বুড়ো ভদ্রলোক বলাইকে বসিয়ে যত্ন করে কি যে করবেন ভেবে পেলেন না যেন। বললেন—তুমি বাবা সাক্ষাৎ নারায়ণ। তুমি এমন ভাবে না এলে পরে আমার গীতার আজ বিয়ে হতো না। কি ক'রে যে গরীব সংসারে দুই হাজার টাকা নগদ আর বিশভরির গয়না দিয়ে পাত্র যোগাড় করতে হলো! কি করবো...

মনের আবেগে ভদ্রলোক অনেক কথাই বলে চলেন। বলেন—ছেলেটি ভাল। সবাই বললে। আর আমার ছেলে-ও বড্ড ঝুঁকলো। বললো বাবা আমি যেমন করে হোক চালিয়ে নেবো। এমন সম্বন্ধ ছাড়ব না। তা ছেলে তো আমাকে বসিয়ে রেখে নিজে ছুটেছে—এখন কখন ফেরে, কি করে।

গিন্নী মিষ্টি আনেন থালা সাজিয়ে। বিয়ের কনে, নতুন-কাপড় পরা একটি সলজ্জ মেয়ে এসে দাঁড়ায় সরবৎ আর পান হাতে। মা

বলেন—দেখ্ গীতা, কলিকালেও এমন মানুষ হয়। ইনি না থাকলে আজ তোমার বিয়ে হতো না মা!

একটি দুঃখী পরিবারের অন্তরের আশীর্বাদ অজস্র ধারায় বলাইকে যেন ভিজিয়ে দেয়। চলে আসবার কালে বুড়োমানুষটি গাঢ়স্বরে বারবার আশীর্বাদ করেন বলাইকে! বলেন—বাবা, আমার সঙ্গতি নেই বলতে লজ্জা পাই। তা এই একখানা নোট তুমি রাখবে বাবা?

বলাই মাথা নাড়ে। ভদ্রলোক কেমন হতভম্ব হয়ে ভাষা হারিয়ে চেয়ে থাকেন। তোবড়ানো গালে যেন জল চিকচিক করে। চলে আসে বলাই।

একশো টাকা ঋণ করে ফিরিয়ে দিয়ে আসবার অবস্থা তার নয় আজ। তবু বলাইয়ের কিছু মনে হয় না। ভালই লাগে। মনে হয় একটা ভাল কাজ করে এসেছে সে আজ।

হাওড়া থেকে বাড়ী ফিরতে পথে প্যাসেঞ্জার নিতে একটু দেরী-ই হয়েছিলো। বাড়ীতে যে বেণুর জ্বর, সে কথা মনে জেনে-ও যেন মনে ছিলোনা বলাইয়ের। বাড়ীতে ফিরে গাড়ীটা টিনের চালাঘরে ঢুকিয়ে সে ঘরে উঠতে না উঠতে এগিয়ে এলো ভোমরা। অনেকক্ষণ উদ্বেগ আর শঙ্কা চেপে রেখেছে, এখন যেন আর পারলো না। আধা কান্নায়, আধা ফুঁপিয়ে বললো—একেবারে বসোনি গো তুমি! দুর্গা-ডাক্তারকে ডেকে নে' এসো। দু'বার লোক পাঠিয়েছি—ফেরেনি ঘরে। এতক্ষণে ফিরেছে বুঝি! বেণুর যে বড্ড জ্বর বেড়েছে। ভুল বকছে। যেন নেতিয়ে পড়েছে ছেলে।

—কথায় কথায় ডাক্তার! দে, মাথাটা ধুয়ে দে!

বললো বটে। তবু ডাক্তারের কাছে ছুটলো বলাই। ডাক্তার এসে মুখ হাঁড়ি করলেন। বললেন—বলিনি বলাই তোমায়! বলিনি? যে এমনি করে করে শরীরটা ছেলেটারে কমজোরি করে ফেলেছ তুমি! এখন যে ওর দেহ থেকে রোগকে বাধা দেবার ক্ষমতা-ই চলে গিয়েছে।

—তা কি হয়েছে ওর—ডাক্তারবাবু ?

—আমার মনে হয় টাইফয়েড।

—টাইফয়েড ?

—সন্দেহ হয়। জ্বরের ওপর জ্বর আসছে ছ'দিন ধরে। তবে রক্ত, পেচ্ছাব, পায়খানা সব পরীক্ষা না করে কিছু বলবো না।

শেষ অবধি ডাক্তারের আশঙ্কা-ই সত্যি হয়। টাইফয়েড। এই ক্লোরোমাইসেটিনের দিনে প্রাণের আশঙ্কা হয় তো নেই। কিন্তু এখন কিছুই বলতে চায় না ডাক্তার।

॥ দশ ॥

রাজকীয় অসুখ। রাজকর নিতেও ছাড়লে' না। চিকিৎসাও হলো রাজসমারোহে। ডাক্তারবাবু একটি পয়সা ছাড়লেন না। নিতাই-চাঁদের ছেলের হঠাৎ পয়সা হবার খবরটা তাঁর অজানা ছিল না। বেডপ্যান্, ডুসপ্যান, আইসব্যাগ, নতুন বিছানা, থার্মোফ্লাস্ক, ওষুধ, ইন্‌জেকশান, আঙুর, আপেল, কমলালেবু, হরলিক্‌স।

কার্পণ্য করলোনা বলাই। বেশী বেরুতে পারে না। কামাই হয়না তেমন। তা বলে কি মাস গেলে দেনা শুধতে হবে না? এক একবার বলাই ভাবে যাবে না কি কাবলীর কাছে? ভোমরা শুনে ভগবতীর ছবি সাঁটা দেওয়ালে মাথাকোটে। বলে—যথেষ্ট হয়েছে। আর দেনদারী হয়ো না তুমি।

বেণুর অসুখের খবর পেয়ে চলে আসে মাণিক, জ্ঞান, গঙ্গা। দেখে শুনে যায়। সময় পেলে ভোমরা-র ফাই-ফরমাস খাটে।

সুধীরকে বিজলী না বলে পারে না—এমন বিপদে পড়েছে যে কালে সে কালে একবার গেলেও তো পারতে?

—সময় হয় কই? তা ছাড়া খবর তো নিচ্ছি।

—আমি যাব একবার?

—তুমি?

এমন অবাক হয় সুধীর, যে তাই দেখেই বিজলীর গা জ্বলে যায়। বলে—হ্যাঁ, আমি। কেন, অবাক হলে?

—তুমি না দুটি বেলা বলাইয়ের নামে কোটনামী করতে?

—সে যবে করিছি, তবে করিছি।

—না, বলাই মানুষ তেমন নয়। তুমি-ই ঠিক বলিছিলে। একেবারে বদলে গিয়েছে ট্যাক্সি কিনে। আর তুমি যে যাবে বলছো; বলাই তোমার নামে কি বলেছে জান না?

সুবল ভেজাচুলের জলছিটিয়ে বুরুশ চালাতে চালাতে বলে—কারখানায় এসে অবধি বলে গিয়েছে। যে, বৌয়ের কু-বুদ্ধিতে বদলে যাচ্ছে জামাইবাবু—আরো কত কি!

—অমন কুবুদ্ধি না হলে আর ঐ দুরবস্তা?

বলে চলে যায় বিজলী। সত্যি একজনের এত অবিশ্বাস অনাদরে বাঁচতে পারে মানুষ? খুব রাগ হয় ঐ ঘাড় সরু মিচ্‌কে চেহারার গোঁয়ার ছেলে বলাইয়ের 'পরে। আবার রাগ ভুলে দুশ্চিন্তা হয়। নিজে না গিয়ে সুবলকে ডেকে বাবু, বাছা বলে টাকা ঘুঁষ দিয়ে পাঠায়। বলে—তোরা তো কারখানার বন্ধু? তুই নিজে তো জানিস্ ঐ বলাইকে? শোন্, এই দুটো টাকার কমলালেবু কিনে খোঁজ নিয়ে আয় ছেলেটার।

ছেলেটার অসুখে তিতিবিরক্ত বলাই, সুবলকে দেখেই রেগে যায়। বলে—কে বলেছে ফল দিয়ে আদিখ্যেতা করতে? ছেলের অসুখে নানান ঝামেলায় রইছি আমি। জ্বালাতে এসোনা বাবু। এদিকে ফুসলে ওস্‌কানি দে, ট্যাক্সিটা বাগিয়ে নিতে চেষ্টা করছে তোমার দিদি—আমি জানি না?

বলাই মনের রাগে দুঃখে যা বলে, বিজলীর কানে তা সাতখানা হয়ে পৌঁছয়। কারখানা ছেড়ে সুবল বেরিয়েছিলো বলে বাড়ীতে এসে রাগ করছিলো সুধীর। বিজলী না বলে পারলোনা—তুমি বলতে পার না কিছু?

—আমি?

একটা শাণিত হাসি খেলে গেল সুধীরের মুখে। বললো—খেতে দাও। কথা কয়ে লাভ নেই।

—কেন, লাভ নেই কেন ?

চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েও চুপ করে গেল বিজলী। কথা কইলে ঝগড়াই বাড়বে। একথা সত্যি, যে সুবলকে কিছু বলা না বলা নিয়ে কম ঝগড়া হয়নি তাদের দুজনের মধ্যে। কিন্তু তাই বলে সুবল অন্যায় করলেও কিছু কইবে না সুধীর ? বোঝেনা বিজলী।

এমনি সময় সুবল ঢুকলো ঘাড়ে কলার তুলে। ঠাস করে একটা ঠোঙা নামিয়ে রাখলো মেঝেতে। বললো

—তোর যেমন কথা ? বলাই কত অপমান করলে তোরে, তা জানিস ? বললে তোর দেওয়া ফল খেতে হবে না ওর ছেলের !

—তুমি বলাইয়ের ছেলেকে ফল পাঠিয়েছিলে ?

সুধীর অনেকদিন এমন করে প্রশ্ন করেনি। গলাটা ঠাণ্ডা আর রাগী। ভয় পায় বিজলী। সুধীর বলে

—তুমিই তাহ'লে সুবলকে ছেড়ে যেতে বলিছিলে ?

—না।

খুব ভয় পেয়েছে, আর লজ্জা অপমান পেয়েছে বিজলী। তাই তার গলাটাও কেমন যেন শোনায়। বলে

—বলিছিলাম একবারটি খবর নে' আসতে আর লেবু কটা দে' আসতে। অসুখের ছেলে! তা সুবল, তুই যে সেই তালে কারখানা ছেড়ে বেড়িয়ে বেড়াবি চারঘণ্টা তা তো জানিনে ?

—এখন ঐ বলাই মুখের 'পরে অপমান করলো, তা সইলো ত ? ছ্যা ছ্যা! তোমার জ্বালায় আমি আর তিষ্ঠুতে পারি না একদণ্ড। এখন দেখছি বাইরেও টেঁকা যাবে না! তুমি বাবু বুঝেশুনে চল! আর সুবল, তোমারে যদি কারখানায় কাজ করতেই হয় তো বুঝে শুনে চলতে হবে!

তারপর সুধীর সুবলের ওপর রাগের মোক্ষম কথাটি ছুঁড়ে মারে। বলে

—ঐ ডাক্তারবাবুর মেয়ে নে' বেড়িয়ে বেড়াবে তুমি গ্যারেজের গাড়ীতে তা হবে না। বলেদিলাম!

বিজলী আজ রাগে দুঃখে দিশাহারা হয়। বলে

—আমি কাল রাতপোয়ালেই চলে যাব। আর ফিরব নাকো! তুমি তোমার মতো সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো!

ঘরের মেঝেতে কমলালেবুগুলো গড়াগড়ি যায়। বিজলী গিয়ে রান্না-ঘরের বারান্দা দিয়ে দুপদুপিয়ে ছাদে উঠে যায়। আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। চোখের জল আর নিস্ফল হতাশা তার মনটাকে ব্যথা দেয়।

আঁধার বাড়ে। বিজলীর মনে-ও মাথাকুটে মরে আঁধার সব চিন্তা। এতদিন হলো বিয়ে হয়েছে। স্বামীর ঘরে, নিজের এতটুকু অধিকার জন্মেনি তার? এমনি করে সুধীর তাকে চলে যেতে বলবে আর সে চলে যাবে? বেশ, তাই যাবে। একটা ভীষণ কিছু করে যাবে না কি? এমন ভীষণ একটা সর্বনাশ, যে যা সুধীরের মনটাকে তছ্‌নছ্‌ করে দেয়? ভুলিয়ে দেয় অন্য সব চিন্তা? কি করবে সে? গলায় দড়ি দেবে? রান্নাঘরে গিয়ে আগুন দেবে কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে? মা গো! ভাবলেই যে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু তেমন না করলে কি সুধীরের মনে নাড়া পড়বে। তখন হয়তো সুধীরের চৈতন্য হবে। এসে কেঁদে পড়ে সুধীর বলবে, যে—না বৌ, আমি কোনদিন-ও চাইনি তুমি অমনটা কর।

ঝুপসি আঁধার ছাদ। অন্যদিনে বিজলী এখানে একলা আসতে ভয় পায়। মনের তলায় কত রকম অজানা ভয়ের বাসা। আজ কিন্তু সে সব আর মনে হয় না তার।

তার-ও পরে নিচে আসে বিজলী। সুধীরের গলার ডাক শুনে।—শোন, এসো। নিচে এসো।

ডাকলেই আসবে কেন সে? তবু নেমে আসে বিজলী। এখন আর তার মান বাড়াবার ইচ্ছে নেই। গম্ভীর মুখে নেমে আসে।

কার সঙ্গে কথা কইছে সুধীর। কারখানার ছোকরা জ্ঞান। সুধীর জামা পরছে। পকেটে পয়সা নিচ্ছে। বিজলীকে বলে

—জ্ঞান বলছে—বলাইয়ের ছেলেটার নাকি বড্ড বেড়েছে। রাতে থাকবার জন্যে ডেকেছে জ্ঞানকে। আমি যাচ্ছি। তুমি যাবে না কি ?

বিজলীর মুখের দিকে না চেয়ে-ই কথা কয় সুধীর। আর বিজলী-ও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে ক'রে বলে

—হ্যাঁ জ্ঞান, বড্ড কি বেড়েছে ?

—বলাইদা তো তাই বল্লে।

—তো, তুমি কি বল ?

প্রশ্নটা সুধীরকে। সুধীরের জবাব একটু লজ্জিত, বিব্রত।

—গেলেই ভাল দেখাতো। তাই নয় ?

—আমি গেলে ?

—বলাইয়ের মাথা গরম। অসুখে বিসুখে ছেলের চিন্তায় আরো দিশা নেই তার।

—তো চল।

বলাইয়ের বাড়ীতে ডাক্তারের গাড়ী। অনেক মানুষ এসেছে। ঘরের যেন বাতাস বন্ধ। বলাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুখ শক্ত করে বিড়ি টানছে। সুধীর বুঝতে পারে বলাই ভীষণ ভয় পেয়েছে। বলাইয়ের কাছে দাঁড়ায়। বিজলী যায় ভেতরে।

ডাক্তার বনাম রোগের বেশ খানিকটা সময় যায়। তারপর উঠে দাঁড়ান ডাক্তার। বলেন—এই ক্যাথিটার ধরে বসে থাকতে হবে। বেশ শক্ত হাত হওয়া চাই। কাঁপলে হবে না। বেণুর মা, তুমি বাছা উঠে যাও।

বিজলী বসে পড়ে। ভোমরা পাশেই বসে থাকে। নিঃশব্দ চলাফেরা। সকলের ব্যস্ততা, এরই মধ্যে ঘণ্টা দুই সময় নিয়ে আস্তে

আস্তে বিপদটা কেটে যায়।

অনেক রাতে রিকসা করে ঘরে ফিরতে ফিরতে সুধীর খানিকটা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে আঁধারের দিকে চেয়ে বলে

—রাগ ঝাল হলো মানুষের শত্রু। রাগলে মানুষ খপ্ করে কি বলে না বলে তার ঠিক আছে?

জবাব দেয়না বিজলী। এতক্ষণ সে রুগী নিয়ে শক্ত হয়ে বসেছিলো আর তাকে বারান্দা থেকে অনিচ্ছুক প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছিলো সুধীর আর বলাই। তা বিজলী জানে। তবু এখন তার বড়ই ক্লান্ত লাগছে। জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না। সুধীর আবার বলে

—সে কথায় দোষ ঘাট নিও না। আর,...

চেয়ে থাকে বিজলী ঘাড় ঘুরিয়ে। সুধীর অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে

—আর, যেতে হবে না তোমায়।

ভাল হয়ে গেছে বেণু। এখন সিন্ধুকে বলাইয়ের আর বলতে গেলে দেড়শো-টি টাকা পড়ে রয়েছে। বলাইকে চারদিন বাদে সাড়ে পাঁচশো টাকা দেনা শুধতে হবে। কোথা দিয়ে কি হবে? বলাই জানে, আর একটি পন্থা পড়ে আছে।

কি করতে হবে না হবে, তা মনে ক'রে কিন্তু বলাইদাস আজকে আর মাথায় হাত দিচ্ছে না। কেননা সে ভাল করে-ই জানে কি করতে হবে।

সারা দিনমান একভাবে গেল। ভোমরা আর মা গিয়ে কালীঘাটে পুজো দিয়ে এলো মানসিকের। বসে রয়েছে বলাই বারান্দায়। ভাবছে সাত পাঁচ। সেই এক দিনের পর বিজলী আর আসে নি। আসবেই বা কেন? বলাই বুঝতে পেরেছে ও সব মেয়েদের কূলকিনারা সে কোনদিন-ও পাবে না। ঐ মেয়েই, সুধীরকে ট্যাক্সি কব্জা করবার

বুদ্ধি দিয়েছে নিশ্চয়। বলাই নিজের চিন্তায় অন্ধ হয়েছে। তাই সুধীরের প্রস্তাবে যেটুকু ন্যায্য তাও দেখতে পাচ্ছে না। সুধীর বলছে, ট্যাক্সিটা পারসেণ্টেজে চালিয়ে—তুমি দিন পনেরো টাকা নাও। আমার আর কোম্পানীর ধার দেনা শুধে যা থাকবে তা আমিই নেব। তাড়াতাড়ি শুধবে তোমার দেনা। তারপর তুমি নিও তোমার গাড়ী।

বলাই বলছে—তোমার প্রস্তাবটায় আমি সায় দেব কি ক'রে? ট্যাক্সি ঠিকমতো চললে মাসে অতিকম হাজার বারোশ' উঠবে। পনেরো পারসেণ্ট হিসেবে আমার সাড়ে চারশো—আর আমার টিফিন খাট! এই দিয়ে যা থাকবে, সব তুমি কেটে নাও না কেন? তবে তো তোমার আড়াইশো'র জায়গায় তুমি মাসে তিনশো' সাড়ে তিনশো হিসেবে শোধ করে নিতে পার? তা তো তুমি নেবেনা! সেই কথামতো আড়াইশো' কাটবে—কোম্পানীর ধার শুধতে আর বাকি টাকা লাভ রাখবে।

এ পর্যন্ত ভেবেই বলাইয়ের মাথাগরম হয়। কেন? তা কেন হবে? কিন্তু মাথাগরম করবার সময় তো নয়।

রাতের আঁধার নামলে বলাইয়ের ট্যাক্সি গেল হাজরাগরছার মোড়ে। কারখানার ইয়ার্ডে কোন সাড়াশব্দ নেই। আঁধার ইয়ার্ড। শুধু একখানা ছোট ঘরে বাতি জ্বলছে। বলাই জানে ওখানে কে বসে আছে। জানে যে ওখানে যে বসে আছে, সে তার দুর্দিনের সকল খবর-ই রাখে। আর এ খবর-ও ঐ মানুষটার জানা, যে ঘুরে ফিরে বলাই তার দোরেই আসবে। পনেরো বছরের সম্পর্ক! তার কথাটা-ই আগে মনে পড়বে বলাইয়ের।

আজকে বলাইয়ের ঢোকার ধরণটা-ই অন্যরকম। সেই মাথা উঁচু করে চুলে ঝাঁকি দিয়ে পথ চলা স্বাধীন মেজাজের ছেলেটা কোথায় গেল? যে নিজের হিম্মতে ট্যাক্সি পারমিট জোগাড় করলো। যে স্বপ্ন দেখলো স্বাধীন জীবিকার? এ বলাই সে বলাই নয়। মোটর মেকানিক বলাই দাস এসেছে তার পুরোন মনিবের সামনে। নোংরা সার্ট, ঝোলা

কলার, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, ষ্ট্র্যাপ ছেঁড়া চটি ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে ঢুকলো বলাই। মাঝে আলো জ্বলছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বসলো বলাই। সুধীরকে-ও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সুধীর বলে—সেই জন্যেই আমাদের সাজেনা কো। জানলি বলাই? পেছনে মোটা টাকার জোর থাকে—নামে বেনামে একজন পাঁচ দশখানা ট্যাক্সি কণ্টোল করে, তাদের সাজে।

—ঝা বলো।

—এখন কি করতে চাস্?

—কি করতে বল?

—তোর ট্যাক্সি। তুই বোঝ্! আমি কি বলবো?

—এ মাসে তোমারে একটা টাকাও দিতে পারব না।

—গত মাসে-ও না বাকি রেখেছিস?

—একশো বাকি রেখেছি।

—তবে?

—বললাম তো!

লুকোছাপা নেই। হাতের তুরুপের তাস চিৎকরে দেখাচ্ছে বলাই। এই তার অবস্থা। সৎভাবে, স্বাধীনভাবে, শিরদাঁড়ার জোরে বাঁচতে চেয়েছিলাম। যে করেই হোক, জড়িয়ে গিয়েছি। তাই তোমাদের শর্ত-ই মানতে হবে। কি করবো। গর্তে পড়েছি যে।

কিন্তু তাই বলে এই ভেবনা যে কৃতজ্ঞ হয়ে আমি বলবো—বাঃ বেশ করেছো তোমরা।

আর এ কথা-ও বলবো না, যে তোমরা বড় মহানুভব।

জীবনসংগ্রামে হারজিত উঠতি পড়তি আছে। এখন আমি পড়ন্ত। তাই বলে তোমাদের কথাই মেনে নেবো? কেমন করে মেনে নেবো? টাকা-ই সব? মানুষ আর মানুষের চেষ্টা-টা কিছু নয়? তাই যদি হয়,

তবে এই যে তুমি—সুধীরবাবু, আমার ট্যাক্সিখানা নিজে হাতিয়ে নেবার চেষ্টায় আছো, তোমার মুখেচোখে দোষী দোষী ভাব কেন? কেন আমার চোখের দিকে চাইতে পারছো না? কেন তোমাকে কমজোরী দেখাচ্ছে?

বলাই কথা কইতে সুরু করে। বলে

—টাকার দেনদার। টাকা শুধবো কেমন করে সেই কথা বল। পারমিট আমার নামে। পারমিট প্যাঁচে পড়ে ছেড়ে দেবো, তা ভেবনি।

—সে কথা কে বল্‌ছে? আমি বলিছি?

—তাই বলছি।

—আমি বলি এক কথা। সংসারী মানুষের জ্বালাপোড়ার অন্ত নেই।

—সে আর তুমি কি বুঝলে বল সুধীরদা!

আঁতে ঘা লাগে। মর্ম জ্বলে যায় সুধীরের। উদভ্রান্ত ক্রুদ্ধচোখে চায়। বলে

—কি বলতে চাস্ বলাই?

—কি বললাম? বললাম ছেলে নেই, দায় ঝক্কি নেই—তোমার সঙ্গে আমাদের কি তুলনা হয়?

—অ!

সুধীর বিড়ি টেনে টেনে নিজেকে সংযত করে। তার নিজের দুঃখ-কষ্টের কাহিনীও জমেছে একঝোলা। বলাইয়ের সঙ্গে দুটো কথা কইবার সখ ছিল। ইচ্ছে ছিল যে বলবে, বলাই রে, আমার জীবনটাও কেমন যেন হয়ে গেল। সেই তোর ছেলের অসুখের রাতে আমি বিজলীর সঙ্গে বড় ঝগড়া করেছিলাম। দুটো কড়া কথা বলেছিলাম। আবার সে রাতে তার মুখখানা দেখে কষ্টও হয়েছিল। তাকে আদরও করেছিলাম। কেন যেন সে রাতে তারে বেশ ভাল লেগেছিল। কেন যেন সে রাতে শান্তিলতাকে একবারও মনে পড়েনি! আর সেই রাতে

তাকে মনে মনে নাম দিইছিলাম বিজলীলতা। ভেবেছিলাম আদর ক'রে তাকে লতা বলে ডাকব। তুই জানিস্—আর কেউ জানুক না জানুক, যে শান্তিকে আমি চিরটাকাল 'শান্তু' বলে ডেকেছি। শান্তিলতা ছিলো তার পোষাকী নাম। তাকে লতা বলে আমি কোনদিন ডাকিনি।

যাহোক, সেই রাতে আমি মাপচেয়ে বলেছিলাম—আমারও বয়স হচ্ছে। তোমার-ও আমি বিনে গতি নেই। এসো বৌ দু'য়ে মিলমিশ করে থাকি।

সে মেনে নিয়েছিল। তার যে বুকে অত দুঃখ ছিল তা কি আমি জানতাম ?

ভোর রাতে আমার হাতে মাথার কাঁটা বিঁধলো। ঐ একগোছা কাঁটা ছাড়া খোঁপা বাঁধে না কো! আমি চোখ খুলিনি। বলিছি—লতা, কাঁটা সরিয়ে নাও! লতা, কাছে এসো! তুমি ভেবনা, যে আমি তোমাকে ভুলে থাকি!

ব্যস্। সেদিন-ই চলে গেল বাপের বাড়ী। আমি কত ক'রে বললাম। বুঝিয়ে, রেগে, ভালবেসে! সে বুঝল না। আমার কাছে এসে খুব আন্তরিক হয়ে দাঁড়ালো। আমাকে খুব বুঝিয়ে বললো।

—ওগো, এ রাগঝগড়ার কথা নয়। আমাকে বে' করে তুমি দয়া করেছ। সব মান্‌লাম। কিন্তু আমার তোমার মধ্যে যে মোটে বনিবনা হলো না। তুমি আমাকে বোঝনা। আমি তোমাকে বুঝিনা। ডাকতে গেলে তুমি তোমার সেই বৌয়ের নাম ধরে ডাকো। তুমি ভেবনা, যে আমি তাকে হিংসে করি। সে তো ভাগ্যিমানী। স্বর্গে গেছে। তা বলে আমার হক্ তুমি আমারে দিলে না কেন ? আমি কি তোমার বিয়ে করা বৌ নই ?

আমি বললাম—কি দিইনি তোমায় ? বল ?

সে বললো—গয়না কাপড় দিলে-ই সব সুখ হয় ? ছি। তাই ভাব তুমি আমাকে! তাইতো বলছি এমন সম্পর্ক আমি আর টানতে

পারছি না। সকল গহনা রেখে গেলাম। খরচার সামান্য টাকা নিলাম। আমি সেখানে যাই।

আমি না বলে পারলাম না—কবে আসবে?

চিরদিন কুঁদুলী। ঝগড়াটি। আজ কিন্তু সে ঝগড়া করলেনা। আমারে পেন্নাম করে চাবিগোছা হাতে দিয়ে বললো

—যেদিন তুমি আমারে সত্যি সত্যি ডাকবে, সেদিনই আসব।

বলে গেল—আমার ভাইরে টাকা দিওনা। আমার বাবারে টাকা দিওনা। আমারে বিয়ে করে তুমি তো চুরির দায়ে ধরা পড়নি? যে জন্মকাল ধরে ঘুঁষ দেবে তাদের? কেন দেবে?

এ সব কথা আজ বলাইকে বলবার ইচ্ছে ছিল সুধীরের। বললো না। এ কথা বলবার ইচ্ছে ছিল, যে বলাই—তোকে কি বলবো! মনে মনে কালীর কিরে খেয়েছি মেয়েমানুষের অত তেজ ভাল নয়। আসবে তো আসুক! তার ঘর, তার দোর! আমি কেন কথা কইতে যাব?

এ কথা-ও বলতে ইচ্ছে ছিল, যে বলাই রে—আমার ঘর দোর যেন খালি খালি বোধ হয়। ছাখ্‌গে যা! আমি তারে কোনদিন-ও কালীবাবুর মেয়ে ছাড়া অন্যচোখে দেখিনি। তার বাপের সেই দুরন্ত লোভটা আমি ভুলিনি। আর সত্যি কথা বলতে কি, বিজলীকে আমি কেন যেন তার বাপের থেকে আলাদা করে দেখতে পারিনি।

এখন যেন ঘরে মন বসেনা। বিছানা কাপড়ের হাল নেই। রান্নাঘরে মাকড়সার জাল। আর তার গয়না কাপড় তার একখানা-ও সে নিয়ে যায়নি। দেখে দেখে মনে দুঃখ হয়।

এতগুলো মনের কথা সুধীর বলাইকে বলবে বলে ঠিক করেছিলো। অন্ততঃ আশা করেছিলো। কিন্তু বলাইয়ের ভাবগতিক দেখে সে ভাব তার মরে যায়। মনে শুধু বিশ্রী সব শয়তানী ভাব ঘুরতে থাকে। সুধীর কিছুক্ষন চেয়ে চেয়ে বলাইকে বলে

—সে ত' সত্যি কথা-ই। তোমার আমার এক ঝামেলা কেন হতে যাবে বলাই ?

বলাই চেয়ে থাকে। সুধীর আবার বলে

—যতকাল না ধার দেনা সুধছো তুমি, ততদিন পনেরো পার্সেণ্টে চালাও বলাই। যেমন পঞ্চাশটা ট্যাক্সি ড্রাইভার চালাচ্ছে। ছুটো করে টাকা খাই খরচা নাও। শ'য়ে পনেরো তোমার। বাকি টাকা থেকে আমি-ই ধার দেনা দেবো।

একথাটা কম ভয়ঙ্কর নয়। তবু বুদ্ধিগ্রাহ্য। ঢোঁক চিপে তাতেই রাজী হলো বলাই। বললো

—তাই হবে। ধারটা শোধ হোক্ ত ?

—আর...

—আর কি সুধীরদা ?

—আর গাড়ী কাল থেকে গ্যারেজে-ই থাকবে বলাই। তাতে ক'রে তোর-ও চাড় আসবে। আর যদি পরের গাড়ী বলে জানিস্, তবে একটু রেয়াৎ করে চালাবি, এই যা !

সুধীরের চোখে চোখে চেয়ে চেয়ারটা হঠাৎ সশব্দে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ে বলাই। বেরিয়ে আসে।

সেদিন রাতে বলাইয়ের ঘাড়ে পুরোন গোঁয়ার্তুমির ভূত চাপে। টিনের চালার দরজা খুলে ঢোকে বলাই। বালতি করে জল বয়ে আনে আর মুছে মুছে চকচকে করে গাড়ীটাকে। আজকে কলিজায় জোর চোট্ খেয়েছে বলাই। রাত বুঝে বুকে সেই ব্যথাটা পাথর হয়ে চেপে বসেছে। আজ একটা কিছু করতেই হবে বলাইকে। না করতে পারলে সে মরে যাবে।

গাড়ী সাফ করা শেষ হলে হ্যারিকেন ধরে ভাল করে দেখল গাড়ীটাকে। বসলো ড্রাইভারের সীটে। তারপর একরকম শুকনো আর

বোবা কান্না বুক ঠেলে উঠলো তার। একটা পুরুষমানুষ যে কত নিঃসঙ্গ এই দুনিয়ায়, তা তো আগে জানেনি বলাই। তার বৌ আছে, ছেলে আছে, মা আছে। তবু এই একবুক নিঃসঙ্গতা থেকে সেই সব আপনজন তাকে বাঁচাতে পারবে না। তার দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে অন্যায় করে কব্জা করেছে তাকে অপর পক্ষ। সে ছাড়া তার আর কেউ নেই। তাই নিজের কাছেই দুঃখ জানিয়ে মাথা নিচু করে রইলো বলাই।

রাত পোহালে ট্যাক্সি নিয়ে বেরুবে বলাই, এসে হাজির হলো সুবল। সুবলকে পাশে বসিয়ে বেরিয়ে গেল বলাই। রাতের বেলা সুধীরের গ্যারেজে গাড়ী তুলে দিয়ে চাবি নিয়ে এলো।

কেন এই ব্যবস্থা হলো, জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না ভোমরা। এ বলাইকে সে চেনেনা। তার জানা মানুষটা যেন বদলে গিয়েছে। এর কথা নেই। হাসি নেই। চোখ তুলে চাওয়া নেই।

গ্যারেজে কথা উঠতে দেরী হলোনা। মানিক, জ্ঞান, গঙ্গা আর রাজু—সবাই কথা কইলো। মদনের কথায় বড় ঝাল। আর, যেখানে যাবে পেটের ভাত ঠিকই পাবে, এই জ্ঞানে মিস্তিরি মানুষ মদন বড় একটা কেয়ার করেনা সুধীরকে। সুধীরের কানে যাতে পৌঁছয় তেমনি করেই সে বললো

—মানুষটার হকের ধনের দিকে টাঁক করলি রে সুবল! তোদের বোনাই শালার ভাল হবেনা। দেখিস্!

বজ্জাতি করে মাণিক ভাল মানুষের গলায় শুধোয়

—কেন গো মদন দা?

—জানিসনি? এ আমার চোক্কে দেখা। এইসব কথা বলতে গলা যতটা তোলা উচিত, তার চেয়ে অনেক উঁচুতে তোলে মদন। বলে

—আমার খুড় শ্বশুর অনেক সাধ আল্লাদ করে আমার শ্বশুরের কাছে টাকা নিয়ে একটা পানের দোকান দিলে। তা শ্বশুরের টাঁক-

ছিলো। হলো কি, সম্পত্তির হিসেব করতে গিয়ে দুইভায়ে লাঠালাঠি। ছলে বলে সে দোকানটা নিলে আমার শ্বশুর। কিন্তু ভোগ হলো না। ভেদবমি হয়ে মরে গেল পরের বছর।

কথাটা বলে বিশ্রী চড়া গলায় হাসতে থাকে মদন। সুবলকে বলে

—সাবধান সুবল! ধার শোধ হলে গাড়ীটা ছেড়ে দিও বাবা! টাঁক করোনি! ধর্মে সইবেনা।

সুবল কিছু না বুঝে হাসে। কোনদিন বা সুধীরের কাছে গিয়ে ন্যাকাপনা করে। বলে

—ট্যাক্সি নে' ওরা আমায় কত কথা কইলে!

—নিজের কাজে থেকো। কান দিও না!

গ্যারেজে কথাবার্ত্তা মোটে কয়না বলাই। এখন সে পুরোদস্তুর পার্সেণ্টেজ বেসিসে ট্যাক্সি ড্রাইভার। গাড়ি বের করে। চালায়। কোনদিন বা সুবলকে ষ্টীয়ারিঙে ছেড়ে নিজে পা তুলে বসে থাকে। যত যা-ই হোক, গাড়ীর চাবি ছাড়ে না বলাই। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে লেগে যায় সুবলের সঙ্গে।

সুধীরবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলো। কারখানার কাজে মোটে আঠা নেই। চুল টানে মুঠো করে। আর আকাশ-পাতাল কত কি ভাবে! ঘরে বাইরে এমন করে সকলের বিশ্বাস হারিয়ে কেমন করে বাঁচে মানুষ? বিজলীর হাতে করে সেখানো ঝি রেঁধে বেড়ে রেখে চলে যায়। আর এ-ও এক আশ্চর্য মন, যে বিজলীর জন্যই মনটা তার খারাপ লাগে। সুবলটা-ও হয়েছে হতভাগা। সমানে টাকা নিচ্ছে। ফুর্ত্তি করছে। দুনিয়ার হালচাল দেখেশুনে সুধীর আজকাল ছোট একটা বোতলের অভ্যাস করেছে। গলাবুকটা জ্বলে ওঠে। কিন্তু তারপর বেশ নেশায় ঘুমটি হয়। তার দাম-ও কম নয়!

গাড়ি চাইবে সুবল, আর দেবেনা বলাই—এমন তো রোজ নিত্যি

চলতে পারে না? তাই থেকেই নতুন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। সুধীর বললো

—মাসে একটা দিন দুটো দিন ওর ওপর ছাড়তে হবে বৈ কি!

তো ছাড়লো বলাই। সেদিন খদ্দের এসেছে গ্যারেজে। কথা কইছে। বলাই পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। হঠাৎ বললো

—বাবু, আজ রং করবেন, পনেরো দিন একমাস বাদে দেখবেন নতুন ঝামেলায় পড়েছে গাড়ী। তার চে' সব দেখিয়ে শুনিয়ে নিন না কেন ওভারহল করিয়ে?

—কে হে তুমি?

—আমি সার বলাই মিস্তিরী। আপনার গাড়ির আওয়াজেই মালুম হচ্ছে, যে ফাটা ফুসফুস! চলবেনা বেশীদিন।

—খুব যে কথা! বলি, খরচা কি তুমি দেবে?

—আপনিই দেবেন! এখন দুশো খরচ করলে পরে হাজার বাঁচবে, জানলেন? ও গাড়ীর নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা।

ভদ্রলোক বরদাস্ত করলেন না। সুধীরকে বললেন—ষ্টাফ্ একটু দেখে রাখবেন! এরকম কথা বলে কেন?

সুধীর বলাইয়ের ওপর রাগ করলো। বললো—কেন কথার মধ্যে কথা কও বলাই? খদ্দের ভাঙাচ্ছো, পরামর্শ দিচ্ছো, গাড়ি নিয়ে বেরোওনি কেন?

—গাড়ি নে' সুবল বেড়াতে গেছে। তুমি জান না?

—না তো! আমায় বলনি কেন?

—কি করবো সুধীরদা! শালা-ভগ্নীপোৎ কার অর্ডার শুনবো বল?

—বড় তোর মুখ হয়েছে বলাই!

—ছোট মুখকে খোঁচাতে নেই। জানলে সুধীরদা? তাহলেই ছোট-মুখে বড় কথা কইবে সবাই।

বাড়ী এসে সুবলকে সুধীর খুব বকলো। বললো—তোমাদের যন্ত্রণায় বাবু আমার ভাল মেকানিকটা গেল! এমন সম্পর্কটা নষ্ট হলো!

ওজনের পাল্লাটা একবার অন্যায়ের দিকে ঝুঁকলে আর যেন উঠতে চায় না। সুধীর আর বলাই ঘেন্না করতে শুরু করলো পরস্পরকে। মাথায় ভূত চেপেছে সুধীরের। সদা-সর্বদা কি যেন ভাবছে বসে বসে। কারখানা লাটে উঠছে। কারখানায় খদ্দের এসে আজ-ও বলাই মেকানিককে-ই খোঁজে। বলাই এমন হয়েছে, যে সামনে থাকলে-ও সাড়া করেনা। বলে

—না মশাই! আমি আর এখানে নেই কো!

অনেক আশা করে সুধীর নতুন গ্যারেজ তুলছিলো। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম বাদ পড়ে পড়ে তামাদি হতে চললো। সুবল বললে গা করেনা সুধীর।

সেদিন অসাবধানে সীট্ চুরি হয়ে গেল একখানা গাড়ীর। সুধীর দাম দিয়ে দিলো বিনা প্রতিবাদে। দেখে শুনে গঙ্গা আর মদন, সব পুরোন মিস্তিরি-রা কপালে চোখ তুললো। মদন বললো—সুধীর বাবু যে দাতাকর্ণ হলো গো! ব্যাপার কি?

ব্যাপার যে কি, কোথায় সে বাধছে, তা শুধোয় না কেউ সুধীরকে। সুবল রাতে এসে একদিন পা ঘষ্টে দাঁড়ায়। সুধীর আশা ভরে চেয়ে থাকে। হয়তো বিজলীর খবর আনবে সুবল। সুবল কিন্তু কোন ভাল কথা শোনায় না। বলে—বাড়ী গিছ্লাম। দিদি একশো টাকা চেয়েছে।

—অ!

—মাসীর সঙ্গে বদ্যিনাথে যাবে পনেরো বিশ দিনের জন্যে।

—আর কিছু বলেনি?

—না।

॥ এগার ॥

বদ্রিনাথে যত না তীর্থ করতে, তত মনের জ্বালা জুড়োতে এসেছে বিজলী। কালীঘাটের বাসা তার অসহ্য হয়েছিলো।

কেন মেয়ে অমন করে টাকা না নিয়ে, গহনাগুলো খুলে রেখে চলে এলো, জিজ্ঞেসা করে করে হার মেনেছে কালীবাবু। বলেছে—কি? অপর মেয়েছেলের ওপর টাঁক দেখলি? কি হলো তাই বল্‌না! অমনধারা এলি কেন?

—এমনি!

—বল, তোরে মেরেছে ধরেছে? জানলি খুকি? কালীবাবুর মেয়েকে অমন মেরে ধরে সায়েস্তা করা সোজা নয়! জানলি?

—সে গায়ে হাত তোলবার মানুষ?

—তবে সুবলরে নে' কিছু হয়েছে?

—না।

—এলি কেন?

—এমনি।

তখনকার মতো জেরা করা ছেড়েছে বটে কালীবাবু। কিন্তু পরম ধৈর্য সহকারে আবার চেপে ধরেছে। বলেছে

—হ্যাঁরে? সুধীরের কি বদ দোষ কিছু দেখলি?

—না।

—কোন কিছু নয়, এমনি চলে এলি?

—হ্যাঁ।

—তোরে খোঁটা দিয়েছে কোন?

—না।

মোলায়েম ভদ্রতা ফেলে দিয়ে কালী অসভ্য হয়ে উঠেছে। বলেছে

—না! সকল কথাতেই না! নেকি, ধুম্‌সি! তবে মরতে এয়েছো কেন?

বিজলী আজকে আর বাপের ভয় করেনি। বাপের ভয় ক'রে ক'রে তার অনেক খোয়া গিয়েছে। আজ সে জবাব দেয়। রেগে কেঁদে বুদ্ধি হারায় না। মাথা ঠাণ্ডা করে চিপ্‌টেন কেটে কেটে বলে

—সে তোমাকে কম খাওয়ায়নি, কম পরায়নি! বলতে গেলে তোমাকে সে-ই পুষছে! তা আমার টাকায় যখন তুমি এত খেয়েছো, তখন আমার এখানে দুদিন থাকবার হক্ আছে বৈকি!

তখন কায়দা বুঝে চুপ করেছে কালীচরণ। আবার বলেছে

—বেশ! তা না হয় এইছিস্, বেশ করিছিস্। এমন হ্যাড়া বোঁচা হয়ে এলি কেন?

—হ্যাড়া বোঁচা হয়েই তো গিইছিলাম। তার জিনিষ তার কাছে রেখে এইছি। দোষ করিছি?

বিজলীর ধীর সুস্থির কথাগুলো শুনে যেন কিছুটা দমে গিয়ে তাকিয়ে থাকে কালীচরণ। ঢোঁকচিপে বলে—তা বেশ! তা বেশ! তা ফিরবি কবে? বলিছিস্ কিছু?

—যখন ইচ্ছে যাবো।

সুবলকে দেখে কিন্তু স্থির থাকতে পারেনি বিজলী। ছুটে এসেছে। বলেছে

—হ্যাঁ সুবল, আমার কথা কিছু বল্লে তোর জামাইবাবু?

—না, না! তুমি-ও যেমন!

—তা কি করে তোর জামাইবাবু?

—জানিনা বাবু! আমি কথা কইতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে। কারবার দেখেনাকো! বলাই মিস্তিরি-র ট্যাক্সি নে' সে নিত্যি লড়াই।

—বলাইয়ের ট্যাক্সি নিয়ে নিলো তোর জামাইবাবু ?

—আহা, একেবারে কি নিয়েছে ? নেবে ! আস্তে আস্তে নেবে ! ঐ পারমিটটি হাতাবে !

—সে কি কথা ?

বুঝে পায় না বিজলী। তবে সুবল বলে

—জামাইবাবু, হাজার হোক, ব্যাটাছেলে তো ! দিব্যি বুদ্ধি আছে, জানলে ? আমারে ট্যাক্সিটা যদি দিয়ে দেয়, তো নিমিষে বেরিয়ে আসি। নিত্যি ঐ কারবারের ঝামেলা ভাল লাগে না বাবু ! খঁ্যাচাখেঁচি, গোলমাল !

বিজলী দেখে সুবলের নাইলনের হাওয়াই সার্ট, রবারের চটি—চুলে শ্যাম্পু। বোঝে, সুবলের সময় ভালই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ যেতে আবার বলে

—তোর জামাইবাবুর খাওয়া শোওয়া একটু দেখিস সুবল ! জানিস তো ? যে মানুষ !

—আমায় বলে দু চোক্ষে দেখতে পারে না ! আমি দেখব তাকে !

—ও কি কথা সুবল ?

—নইলে বলাইরে কিছু কইলে আমায় অমন বকে ?

বিজলীর মনটা তবু অস্থির হয়। রোজই তার আশা থাকে, বোধ হয় সুধীর আসবে। অথবা লিখে পাঠাবে—বৌ, আমি এমন একলা আর পারি না। তুমি এসো।

সে চিঠি কোনদিনও এলো না। চিঠি এলো না। কালীবাবু যখন খোঁজ নিতে গেল, তখন সুধীর বললো

—জানি না তো ! যখন ইচ্ছে হবে তখন আসবে। সে কথা আর বলবার কি আছে। আমি তো জানি না, কেন গিয়েছে।

এই শুনেই মর্মে ঘা পেল বিজলী। সুধীর জানে না ? সুধীরের ঔদাসীন্য আর উপেক্ষা নিয়ে সে তো ভালই ছিল। কিন্তু সেই রাতে ?

একরাতে ঔদাসীন্যের পাঁচিলটা ভেঙেচুরে তাকে কাছে এনে ভালবাসা দিয়ে কানায় কানায় ভরে দিয়ে আবার মরা বৌ-য়ের নাম ডেকে কথা কওয়ার মানে কি হয় ? মানে এই হয়, যে বিজলী যদি-ও সতীনকে এতটুকু হিংসে করেনা, তবু সেই শান্তিলতা, সুধীরের সাধের 'লতা'-ই সবটুকু জুড়ে রয়েছে সুধীরের মন।

তারপরেও আর থাকবার কোনো মানে হয় ?

বিজলীর মা, কালাচরণের মতো প্রশ্ন করে করে বিব্রত করলো না বটে, তবে মেয়েকে সান্ত্বনা-ও খুব একটা দিতে পারলো না।

বিজলীর মাসী আর যা হোক মানুষটা মন্দ নয়। সে বললো—চল্, আমার সঙ্গে বদ্যিনাথ চল্। দিন পনেরো থাকি। তারপর ফিরে এসে দিদি জামাইবাবু না যাক, আমি তোরে সাধা সাধ্যি করে জামাই-য়ের কাছে রেখে আসবোখ'ণ। চালাকি কথা? যেখানে সারাজীবন ঘর করতে হবে, সেখানকার সম্পক্ক নে' অমন হেলা ফেলা করতে নেই।

—তুমি জানো না মাসী।

—তুই চুপ কর বিজলী! তোর কিসের গরব রে ? একটা পুরুষ মানুষকে আদর যত্ন করে বশ করতে পারিস্ না ?

বদ্যিনাথে এসে মাসীর মতো বিজলী দশবার মন্দিরে ছোটেনা। ঘুরে ফিরে দেখে এটা সেটা, আর গালে হাত দিয়ে নিজের সংসারের কথা ভাবে। এমন কপাল, যে বাপ লেখাপড়াটা-ও শেখায়'নি। লেখাপড়াটা ভাল ভাবে জানলেও তো চিঠি লিখে কুশল সংবাদ নিতে পারতো সে। তেমন মান খোয়ানো চিঠি নয়। কুশল সংবাদের চিঠি। —ভাল থেকো।—শরীরের যত্ন নিও।—দুধটুকু খেও। কিন্তু লিখতে জানে না বলে সেটুকু-ও লেখা হয় না।

ও দিকে বলাই দাঁতে ঠোঁট চেপে ট্যাক্সি চালায়। ভোমরা বলে—এত কষ্ট আর কত কাল করবে গো ?

বলাই ভোমরাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে--বৌ। এখন খানায় পড়িছি। জানলি ? যদি ছট্‌ফট্‌ করি—তবে পাঁকে পা আরো চেপে বসবে। আর তিনটে মাস কষ্ট কর্‌। তা হলেই ঐ সুধীরবাবুর ধার শোধ হয়ে যাবে। কোম্পানীর ধার দিয়ে-ও তখন আমার মাসে পাঁচশো টাকা ঠেকায় কে ?

ভোমরা বড় ভাল মেয়ে। বলে—তা ত' বটে-ই।

বলাই বলে—আমি মুখ গোমরা করে থাকলে-ও তুই যেন হাসতে ভুলিসনা বৌ ? তোর হাসিটুকু দেখে আমার বড় ভাল লাগে। আমি যেন দুঃখ ভুলে যাই ।

—কিসের দুঃখ ?

বলাই আরো বলে—তুই কি মনে করিস ওতে সুধীরদা-র ভাল হবে ? কখখনো না !

—না গো। অপর মানুষকে দোষী করো না তুমি !

—ঐ সর্বনেশে মেয়েটাকে যেদিন থে' ঘরে আনল... !

ভোমরা আজ মেয়েদের মন দিয়ে যা বুঝেছে, সেই কথা বলে । গভীর বিশ্বাসের সুরে বলে

—এই কথাটা তুমি অনেক দিন বলেছো, তাই বলি ! ঐ সুবলের দিদির কোন দোষ নেই।

—হ্যাঁঃ তোকে বলেছে।

—তুমি তো বললে মানবেনা ! আমি ওর ঘর দোর দেখিছি, দুটো কথা-ও বলিছি। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ও মানুষটা তেমন সুখী নয় ।

—দেখ্‌ ভোমরা যা বুঝিস না... !

—একটা মানুষ সুখী না অসুখী, তাই বোঝবার জন্যে কি লেখাপড়া করতে বসবো ? তা ছাড়া-ও দেখলাম যে ! বেণু ভাল হতে আমি আর মা গেলাম পূজো দিতে ! হঠাৎ দেখা কালীঘাটের মোড়ে। মুখখানা

শুকনো। হাতে বাজারের থলি। আমাকে দেখে কথা বলতে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো! কিন্তু কি মনে করে মুখ ঘুরিয়ে নে' চলে গেল। সত্যি বলছি, এমন কষ্ট হলো! মুখ খানা যেন কেমন। গায়ে গয়না দেখলাম না! ভারী যেন দুঃখিত চেহারা। ভাল লাগল না। তারপর পুজো দে' বেরিয়ে যখন ঘরের দিকে আসছি—মা বলে, বেণুর জন্যে দুটো খেলনা কিনে নে' বউ! খেলনার দোকানের পাশে-ই দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে সুবলের দিদি! আমি বলি, এখানেই বাপের বাড়ী? সে বলে হ্যাঁ ভাই! তারপর জিজ্ঞেসা করে বেণুর কথা। বারবার বলে—বড় খুশী হলাম ভাই! তারপর কাছে এসে বলে—সুবলের জামাইবাবুর কাছে কি গেছল বেণুর বাবা? কেমন আছে না আছে—জান? আমি অবাক হয়ে বলি—কেন, আপনি জানেন না? সে আসে না কো? মুখখানা যেন চূণ হয়ে গেল। বললো—আসবে না কেন? আসে বৈকি! তবে কি জানো……এমনি সাত পাঁচ কথা কইছিল সুবলের দিদি, হঠাৎ মা এল!

—মা এল তো কি হলো?

ভোমরার কথার মধ্যে খেই খুঁজে পায়না বলাই। ভোমরা বলে

—মা-র তো কথার রাখ-ঢাক নেই! বলে—হ্যাঁ সুধীরের বৌ, তুমি এমন মানুষ তা তো জানিনি! সে বলে কেন মাসীমা, কি হলো? মা বলে—কি বুদ্ধি দিলে মা সুধীরকে—টাকা টাকা বলে আমার ছেলেটাকে অস্থির করে দিলে! সে বলে—বিশ্বাস করুন মাসীমা, আমি কিছু জানি না! মা বলে—তুমি এসেছ থেকে এই সব কাণ্ড হলো! নইলে সুধীর আর বলাই দুজনে যেন দুটি ভাই। চিরদিন সাথে সাথে ঘুরেছে ফিরেছে! এমনটা করা কি ভাল হলো মা? সে বলে, আমি আজ কতদিন এখানে, আমি কি জানি বলুন? মা বুঝি রোদে তাতে গরম হয়ে ছিলো—বললো, অমন করে তোমারও ভালো হলো না বাছা। মেয়েছেলের অমন উড়নচণ্ডে বুদ্ধি ভাল নয় কো! চলে আয় বৌ!

আমার ভারী লজ্জা হলো। মনে হলো গিয়ে দুটো ভাল কথা কই। তা মা দিলে না।

—তুই অমন মেয়ের দিশে পাবি কোথা থেকে বৌ? ও যদি অমন না হতো! না না, তুই বুঝিসনে ভোমরা। তোকে সেই বৌয়ের কথা বলিনি? বলিনি? যে সে ভারী ভাগ্যমন্ত। কেমন মিষ্টি কথা! কেমন হাসিমুখ! এ যেদিন থেকে ঘরে এলো, সেদিন থেকে পালটে গেল সুধীরদা। আর এর স্বভাব-ও যেন ভাল নয়।

—কেমন করে এত বড় কথাটা কইলে?

ফোঁস করে উঠে ভোমরা। বলাই বলে—স্বচক্ষে না দেখে কিছু বলে না বলাই দাশ।

বলাইয়ের রাগ হবার সকল কারণ কেমন করে জানবে ভোমরা! বেণুর অসুখ হতে ছুটে এসেছিলো বিজলী। বুকে করে নিয়ে বসেছিলো বেণুকে। বলাইয়ের ভীতু আঁধার মনে বারবার এই কথাটা বাজছিলো, যে তার দেওয়া লেবুগুলো ফেলে দিলাম। তার ভাইকে পঞ্চাশটা কথা শোনালাম। সেই জন্যেই কি দোষ হলো? সেই জন্যেই কি বেণুর জ্বরটা বাড়লো? মনে হচ্ছিলো এই সব কথা। বিজলী সে অপমান সয়ে-ও যখন এলো, বেণুকে নিয়ে অমন করে বসলো—বলাইয়ের মনটায় ভাল লেগেছিল। আর সন্ধ্যেবেলার অপমানটা ভুলে গিয়ে বিজলী যে ঘরে যাবার সময় তাকে বলে গেল—ভয় পেওনা ঠাকুরপো। আমি এ-রোগে আগে-ও সেবা করিছি। আমার ভাই ঐ সুবলকে। ওষুধ পড়েছে—জ্বর কমলো ঘুম আসছে ছেলের—ভয় পাও কেন? ভয় পেও না। ভয় নেই।

সেদিন কৃতজ্ঞতায় ভেসে গিয়ে বলাই, আবোল-তাবোল অনেক কথাই কয়েছিলো। বলেছিলো, ছেলে সেরে গেলে পরে সে নিজে গিয়ে বিজলীর পায়ের ধুলো নিয়ে আসবে। মাপ চেয়ে নাকে খত্ দিয়ে আসবে!

বেশ ভালই ছিলো মনটা। কিন্তু তার পরেই সুধীরদা-র এই ব্যবহার! বিজলীর তাতে যে কতবড় ভূমিকা রয়েছে, ভেবে বলাই রেগে যায়। সে কি বোঝে না? বোঝেনা, যে সুবলের হাতে ঐ ট্যাক্সিখানা তুলে না দিলে স্বস্তি পাবেনা বিজলী!

বলাই ভোমরাকে বলে

—তুই যা বুঝিসনা, সকল বিষয়ে কথা বলিসনি বৌ!

ভোমরা চুপ করে তখনকার মতো। কিন্তু বিজলীর হতাশার কালি মেখে দেওয়া মুখখানি মনে পড়তে তার কেমন যেন কষ্ট হয়। কেন এমন হয়? বিজলীর গা ভরা গয়না, বাড়ীর জাঁকজমক দেখে না ভোমরা ভেবেছিল বিজলী কত সুখী?

আর ক-দিন না যেতেই এ কি হলো! সুধীর কি তবে বিজলীর কাছে যায় না? পুরুষ মানুষ এমন নিষ্ঠুর হতে জানে? এমন করে উদাসীন হয়ে রইতে জানে? নিজেকে দিয়ে ভাবে ভোমরা। এই যদি তার-ও হয়? তাকে যদি মামামামীর ঘরে অশ্রদ্ধা অনাদরের মধ্যে ফেলে রেখে চুপ করে থাকে বলাই! মা গো! ভাবতে-ও দুঃখ হয় ভোমরার। বিজলীর বাপের অবস্থা-ও না কি ফিরিয়ে দিয়েছে সুধীর। তা বলেই কি আর অমন ভাবে বাপের বাড়ী পড়ে থাকতে ভাল লাগে? তার মামীরা বলতো

—বাপ রাজা তো রাজার ঝি
ভাই রাজা, তো আমার কি!

বাপ ভাইয়ের অবস্থায় কি এসে যায়? বিজলী নির্ঘাৎ দুঃখে কষ্টে আছে। যাক্‌গে! আর ভাবতে পারেনা ভোমরা। মনটা ভারী হয়ে যায়। মনোদুঃখে এদিক ওদিক চেয়ে ভোমরা শাশুড়ীর আচার কাসনের শিশিগুলো রোদে নামিয়ে দেয়। বেনুকে বারান্দার ছায়ায় ছোট মাদুর পেতে বসিয়ে দেয়। বলে—কাক চড়াই এলে তাড়াবি' কেমন?

বেনু গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। ভোমরা ঝাঁটা নিয়ে পরিস্কার ছোট্ট উঠোনটুকু আবার ঝাঁট দিয়ে নেয়। ডালিম গাছে ফল এসেছে। গাছটার ফলন্ত ডাল বাঁচিয়ে একটা নারকেলদড়ি টাঙিয়ে ফেলে উঠোনে। কাচা ওয়াড় গুলো টানটান করে মেলে দেয়। তারপর চট্ করে কুলো নিয়ে চাল ঝাড়তে বসে।

মন খারাপ হলে-ই বৌয়ের কাজের বাতিক ওঠে, জানে শাশুড়ী। কি বলতে গিয়ে-ও কথা বলে না। শূন্যঘরের দেয়ালখানার দিকে চেয়ে বলে

—কিসে যে মন খারাপ হলো, জানিনি বাবু!

॥ বার ॥

সুধীর আর বলাইয়ের সম্পর্ক যে পথে চলেছে, একদিন যে ফাটাফাটি হবেই- তাতে আর সন্দেহ নেই কারু-র। এ কি কম কথা? মিস্তিরি মানুষ হয়ে নিজের একখানা ট্যাক্সি করা? আবার দেনারদায়ে সে ট্যাক্সি বাঁধা রাখা? এখন যে অবস্থা করেছে সুধীর তাতে তো ট্যাক্সি বাঁধা রাখার সামিলই হলো।

বারুদে কাঠিটুকু ছোঁয়াবার অপেক্ষা।

সেদিন সুরু হলো চমৎকার। আর বুঝি তিনটে দিন রয়েছে বিশ্বকর্মা পুজোর। এর মধ্যেই বেশ বোঝা যাচ্ছে ব্যাপার। জুয়েল কোম্পানীর আশেপাশের দুটো ওয়ার্কশপে-ই তোড়জোড় বেশী। আগে-আগে সুধীরের কারখানাতে-ও বাজি পোড়ানো হয়েছে। যাত্রার দল এসেছে চিৎপুর থেকে। ভাল যাত্রাদল। মেয়েরা-ই মেয়ে সাজে। যাত্রার ম্যানেজার টাকা নিয়ে বায়না করবার সময় গর্বভরে সুধীরকে বলে যায়

—তেমন টাকা নিইনা, জানলেন? বিষ্ণুপ্রিয়ার পালা গাইবে দেখবেন সার। চোখে জল ছুটিয়ে দোব।

সত্যিই চমৎকার যাত্রা। কারখানা সাজানো হয় ফুলে, কাগজের মালায়, ইলেক্‌ট্রিক বাতিতে। সকাল থেকে মাইক লাগিয়ে সিনেমার গান বাজে চড়া সুরে। তেমন গান হয়, তো কারখানার ছোকরাগুলোও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে। খুব ফিস্ট হয়। রাতের বেলা বাজি পুড়িয়ে তবে যাত্রা হয়। এবার আর তেমন কিছু জাঁক জৌলুষ দেখা যায় না। রুবি কোম্পানীতে এবার খুব হৈ চৈ। সোজা কথা নয়। গঙ্গা এসে বলে

—রুবি কোম্পানীর মালিক অন্নদরের। বি. এ. পাশ বড়মানুষের ব্যাটা, জানলি? সুধীরবাবুর মতো পিঁপড়ের পেট টিপে গুড় বের করে না। ওর সব বড় বড় মক্কেল, বাঁধা পয়সা। ফিল্‌মের কোম্পানী আছে ওর কাকার! যতো ফিল্‌মের আর্টিস্ট, সবাই ওর কাছে গাড়ী সার্ভিস করায়। এবার বিশ্বকর্মা পুজোয় কি করছে জানিস্ বলাই?

—কি?

—এবার আসল থিয়েটার আনছে। সোজা কথা নয়। সঙ্গে জলসা! সকল রেডিও আর্টিস্ট গাইবে জানলি? দশহাজার টাকা খরচ করছে।

—তো বেশ করছে।

গঙ্গাকে কথার ভাঁজে কিছু বুঝতে দেয় না বলাই। কিন্তু মনে মনে বেশ আনন্দ হয়। এই তো ভাল হলো বেশ! রুবি কোম্পানী জাঁকজমক দিয়ে উঠে কানা করে দিক জুয়েল মোটর কোম্পানীকে। শাস্তি হোক সুধীরদা-র!

গঙ্গা সব বোঝে। গলা নীচু ক'রে বলে

—যে ভাবগতিক দেখছি, জানলি বলাই, আমরা সকলে, মাণিক, জ্ঞান সবাই চাকরী নিচ্ছি বাইরে।

—সত্যি?

—নয় তো কি? মক্কেল এসে ফিরে যাচ্ছে—গ্যারেজ ভাঙা—চুরি হয়ে যাচ্ছে মালপত্তর! খেয়াল নেই কো বাবুর। সুবল সমানে বজ্জাতি করছে, তছ্‌নছ্‌ করছে কারখানা নে'! আর সুধীরবাবুকে দেখগে যা! সর্বদা শিবনেত্তর হয়ে বসে আছে। দিবারাত্তির একরকম ভাব! নেশা-ও করছে বৈ কি! ভোঁ হয়ে বসে থাকে, থেকে থেকে আমাদের ওপর তম্বি করে ওঠে। বাল্‌ব চুরির ব্যাপারটা নিয়ে সেদিন অর্জুনকে কি হেনস্তাটা-ই না করলে! আর আসল কথা জানিস না?

কাছে এসে হেসে, থুতু ছিটিয়ে বিশ্রী ঘড়ঘড়ে গলায় গঙ্গা বলে

—বৌ যে ছেড়ে গেছে? বাবুর এখন মনে সুখ নেই কো? এখন

নিত্যি নিত্যি বাইরে খাওয়া দাওয়া—অষ্টপহর বাইরে ঘোরা। সেদিন দেখি পার্কে বসে আছে তো বসেই আছে! রাত বাজে বারোটা। বুঝলি না বলাই? বাবু এখন শক্ত ফাঁদে পড়েছেন!

বলাই মনের রাগে রোগা ঘাড় বাঁকিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে কথা বলে

—আমার সঙ্গে যে অধম্ম করেছে, তার কখখনো ভাল হবে না! সোজা বেইমানি? আমি ভাল চান্স পেলুম অম্বিকাবাবুর কাছে! জলপাইগুড়িতে এতদিনে দুইখানা ট্যাক্সি করতুম! তা আমারে যেতে দিলে না সুধীর দাদা। এখন দেখ্ আমারে গর্ত্তে ফেলে কি মজাটা দেখছে!

গঙ্গা বলে

—এবার টাকাকড়ি সব সুবলের হাতে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে হবেখ'ন! সুবল বোতল আনবে বলেছে!

ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বলাই। কেন জানিনা, একমিনিট-ও খালি গেলনা ট্যাক্সি। একটার পর একটা মক্কেল পেলো আর চলতে লাগলো। গোলমালটা বাধ্লো রাত আটটায়। ট্যাংরার কাছাকাছি এক গলি। একজন ছেলে, বেশ কাপ্তেন মতো চেহারা। ঘাড় ছাঁটা। হাওয়াই সার্ট, পা জামা পরণে। দাঁড় করালো ট্যাক্সি। বললো—আমার বোন মশাই, ভারী ব্যথা উঠেছে। এক্ষুনি কাটাতে হবে এ্যাপেণ্ডিক্স। নিয়ে চলুন না হাসপাতাল!

—বেলগাছিয়া?

—না, না মেডিকেল কলেজ। সিট বুক করিছি—টেলিফোনে কথা হয়েছে।

—ক'জন যাবেন?

—আমি আর বড়দা! তিনজন। একটু তাড়াতাড়ি। যন্ত্রণায় বুঝি বা অজ্ঞান-ই হয়ে গেল!

বলাইয়ের কোন সন্দেহ হয়না।

গাড়ীটা ঢুকলো মস্ত একটা পুরোণ বাড়ীর নীচে। আষ্টেপিষ্টে ভাড়া দেওয়া একখানা বারোয়ারী বাড়ী। এপাশে পানের দোকান, ও পাশে মাংসের দোকান। মাঝে রাস্তা থেকে দুটো সিঁড়ি দিয়ে উঠেই কালো আলকাতরার দরজা। কিছুক্ষণ সময় যায়। তারপর দুই ভদ্রলোক একটি মেয়েকে ধরাধরি করে আনেন। মেয়েটাকে আধ শোওয়া ভাবে বয়ে আনা হয়। মাথায় ঘোমটা। সর্বাঙ্গ চাদর ঢাকা। মুখের ওপর একখানা হাত ফেলা আড়াআড়ি ভাবে। আর একখানা হাত প্রথম ছেলেটির গলা বেড়ে আছে। দুজনে সন্তর্পণে নামায় বোনকে আর বলে—আর একটু আগে যদি গাড়ীটা পেতাম! অজ্ঞান হয়ে গেল!

পরের ভদ্রলোক বলেন—টেলিফোনে ডাক্তার মিত্তির বললেন তো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ!

ছেলেটি বলাইকে বলে—আপনি সার ঝাঁকা ঝাকুনিগুলো বাঁচিয়ে চালাবেন! একটু জলদি করে বেরিয়ে যান!

মেয়েটির কথা শোনা যায় না। ভদ্রলোক দুজনেই বার বার বোনকে সান্ত্বনা দেন। বলেন—কি কষ্টই পাচ্ছে! আর এতটুকু পথ!

মেডিকেল কলেজের মুখে ট্যাক্সি থামিয়ে তাঁরা দুজন ষ্ট্রেচার ডাকতে নেমে যান। বলাই দাঁড়ায়।

পাঁচমিনিট, দশমিনিট, বলাই অশ্বস্তি বোধ করে। ষ্ট্রেচার আনতে কত দেরী হবে? তার পেছনে দাঁড়িয়ে আরো একটা গাড়ী। একখানা এ্যাম্বুলেন্স হর্ণ দিচ্ছে! গাড়ী এগিয়ে আনে বলাই! শাদা পোষাক পরা দুজন জমাদার। ষ্ট্রেচার বাহক ছুটে আসে এ্যাম্বুলেন্সের পাশে। বলাইকে ধমক দিয়ে বলে

—কি মশাই এমন করে পথ আট্কাচ্ছেন কেন?

বলাই খিঁচিয়ে বলে

—তো আপনারা ষ্ট্রেচার আনছেন না, তার কি হবে?

—রুগী নাকি?

—হ্যাঁ!

গাড়ীটা চালিয়ে এখন এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের সুমুখে আনে বলাই। তারপর হর্ণ দেয় ঘন ঘন। রাগ হয় লোক দুজনের ওপর। আচ্ছা বে-আক্কেলে মানুষ তো! এমার্জেন্সী থেকে মানুষ আসে এগিয়ে। বলে

—কি?

বলাই বলে

—দুই ভদ্রলোক মশাই। বোনকে এনেছে অপারেসান করাবে বলে। বোন বুঝি অজ্ঞান। ষ্ট্রেচার ডাকতে যাই বলে নেমেছে—

ছোকরা ডাক্তার এগিয়ে আসেন। ট্যাক্সির দোর খুলে দেন। বলেন

—কতক্ষণ?

—মিনিট কুড়ি হলো।

ষ্ট্রেচার আসে। খোলা হয় দরজা। ওদিক দিয়ে নিতে সুবিধে হবে বলে মাথার দিকের দরজাটা খুলেই বুঝতে পারে বলাই। গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না তার।

এই রকমই কিছু সন্দেহ করেছিলেন ছোকরা ডাক্তার। অনেক লোক আসে। ঘিরে ফেলে গাড়ীটা। বড় টর্চ জ্বেলে ঝলক ফেলে গাড়ীর ভেতর। পিঠে হাত দিয়ে বলাইকে ঠেলে নিয়ে যায় অফিসের দিকে। তবু তার মধ্যেই যা দেখবার দেখে নেয় বলাই।

অল্পবয়সী একটি মেয়ে। মাথাটা অস্বাভাবিক এক ভঙ্গীতে ঝুলে পড়েছে পেছন দিকে। গলার নলী কাটা। গলার কাছে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চোখ দুখানা খোলা।

তারপর হৈ-হৈ। অফিসে বসে পঞ্চাশটা জবাবদিহি করা। দেখে ডাক্তাররা বলেন, দশ ঘণ্টার পুরোন লাস। চালান হয়ে যায় লাস মর্গের ঠাণ্ডা ঘরে। পায়ে টিকিট বেঁধে জমা হয়ে থাকে চুপচাপ আরো তদন্তের অপেক্ষায়। হাতে কানে সোনার গহনা। তা-ও কম আশ্চর্য করেনা সকলকে।

মরা-মানুষের মরে-ই রেহাই মেলে। জ্যান্ত মানুষের ছাড়া পাওয়া মুস্কিল। পুলিস আসে। বলাইকে প্রচুর জবাবদিহি করতে হয়। গাড়ীর নম্বর দেয়! সে যা জানে সবটুকু বলে। হাসপাতালের চার চারটে প্রধান গেট আটকে কম খোঁজাখুঁজি হয় না। কিন্তু মেডিকেল কলেজ একটা ছোটখাটো শহর বিশেষ। সেখানে কলেজষ্ট্রীট গেট দিয়ে ঢুকে কলুটোলা বা ইডেন হাসপাতালের দিকের যে কোন গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলে কে ধরছে ?

বলাইকে ও. সি. প্রশ্ন করে চলেন। কোথা থেকে উঠলো ? সে বাড়ী দেখাতে পারে ? কি রকম দেখতে ছেলেটি ? ঠাহর করে দেখেনি ? তবে কি করে বলছে জামা পাজামা পরে ছিলো ? বলাই বলে

—ছেলেটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়েছিলো। আমাকে দাঁড় করাতে আমি জামার ছিটটা দেখি। মামুলী ছিট। সাদার উপর হলুদ চৌখুপি করা।

—তবে কি দেখলেন ?

একটু আগেকার ভীতুভাবটা কাটিয়ে এখন বলাই একটু ধাতস্থ হয়। একটু রেগে বলে

—বলতে দিন না সার!—অমনি একটা ছিট আজই আমার ছেলের তরে কিনতে গিইছিলাম। জেদ ধরেছিল বিশ্বকর্মা পুজোয় নতুন জামা চাই। তবে গজ চাইলে আড়াই টাকা ক'রে। তাই নেওয়া হয়নি কো! এখন এই ভদ্দরলোকের জামাটা দেখতেই সেই কথা আমার মনে হলো। সেইজন্যে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম।

—অ!

খস্‌খস্ করে লিখে ও. সি. বলেন—অন্য ভদ্দরলোক ?

—তাঁরে দেখিনি ঠাওর করে। দোরের সামনে বাতি নেই। বললে, মেয়েছেলে আনছি সরে দাঁড়ান! আর কে প্যাসেঞ্জার ঠাওর করে দেখেছে বলুন ?

ও. সি. একটু চেয়ে থাকেন। হেসে বলেন—নিন, সিগারেট খান। একবারটি চলুন, চলে যাই ট্যাংরায়।

—আমি কেন যাব বলুন ?

ঝোঁঝে উঠেই বলাই বোঝে এখন সে যা করবে তা-ই লিখে নেবে ও. সি.। বাধ্য হয়ে বলে—চলুন !

ও. সি. একেবারে জ্ঞানকাণ্ড শূন্য নয়। বলেন—ধরুন না কেন, ভাড়া করছি আমি। চলুন ?

আবার সেই ট্যাংরার বাড়ী। বলাইয়ের কেমন যেন উত্তেজিত লাগে। এ যেন সিনেমার গল্প ! দুটো লোক, কেমন ভদ্দরলোকের মতো দেখতে। তারাই খুনী ?

ট্যাংরার বাড়ার দোর খোলা। ঢুকে তারা দেখে পর পর দুটো ঘর। মাদুর পাতা রয়েছে। খুরি, শালপাতা পড়ে রয়েছে। নতুন হ্যারিকেন জ্বলছে একটা কোণে। আর পড়ে রয়েছে রক্ত।

পুলিশের কাজ সুরু হয়। বলাইয়ের কাজ আপাততঃ ফুরোয়। কিন্তু এ কথা বুঝতে দেরী হয় না যে বলাইকে সাক্ষী-সাবুদ দিতে-ই হবে দরকার হলে। আপাততঃ লাইসেন্স দেখিয়ে বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে নিস্তার পায় বলাই।

পরদিন আর তার পরদিন, পুলিসের হাঙ্গামায় খুব ব্যস্ত থাকতে হয় বলাইকে। ও. সি. ছোকরা মানুষ। উৎসাহী। এই এক কেসে কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি উন্নতি করতে চান। বলাইকে অনেক ইংরিজী কথা বোঝান। বড় দারোগা পুরোন মানুষ। দাঁতের ফাঁক থেকে কাঠি দিয়ে মাংস খোঁটেন, আর মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ দুটো একটা কথা বলে ও. সি-র উৎসাহের আধিক্য দমন করেন। ক'জন সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের দাঁড় করিয়ে চিনতে বলা হয় বলাইকে। বলাই কারুকেই চিনতে পারে না। বলে আসে

—আমি সার, খেটে খাওয়া মানুষ। এমন করে আমার রুটি মারবেন না।

বড় দারোগা বলেন

—তুমি যদি তাল দিয়ে না চল তো নিজেই ফেঁসে যাবে জানলে? এ সব বিশ্রী ব্যাপার!

বলাইয়ের রুজি রোজগারে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। তবু বলাই সুধীরের কাছে এবার বুক ফুলিয়ে যায়। বলে

—সুধীরদা, আর তোমার হাজার টাকা বাকি! আমি এ মাসে-ই শুধে দেব। তবে তোমার হিসেবটা ঠিক করতে হবে। রিপেয়ারের খরচা সুবল দু'শ কাটছে কেন? রিপেয়ার না তোমার?

—অ!

ব'লে খাতা আনতে বলে সুবলকে সুধীর। দেখে শুনে বলে

—এ পুরোন রিপেয়ার। সেই বেণুর অসুখের বার।

—সেবার কি মেরামত করালাম আমি? যে ধার এতদিন বাদে কাটছো? হ্যাঁ সুধীরদা?

অপমানে লাল হয় সুধীর। বলে

—তোকে ঠকাচ্ছি আমি? সত্যি বলাই, ঢের ঢের বজ্জাত দেখেছি—

—সুধীরদা!

তোমার মতো নেমোকহারাম দেখতে আমার আজও দেরী আছে। কোথায় থাকতো তোমার ট্যাক্সি কেনা বলাই? আজ তুমি রিপেয়ারের কথা শোনাও আমাকে? ঐ দেড়শো দুশো টাকা নে' আমি রাজা হব?

বাঁকা হেসে বলাই বলে

—এতক্ষণে মনে পড়েছে! খাতা পত্তর ঘেঁটে দেখো, আর নিজের বুকে হাত দিয়ে জেনো যে বলাই মিথ্যে কথা কয় না। ও তোমার পেয়ারের শালার কাজ। ও-ই ভেঙে এনিছিল গাড়ী। ও-ই সারিয়েছে।

ও-ইখাতা লেখে তাই বিল ধরেছে। সুধীরদা, অনেক কাল গেল, এখন জোচ্চুরি ধরলে তুমি?

—আমি জোচ্চোর? হ্যাঁ বলাই?

—নয়তো এটা কোনো ধর্মের কথা হলো? তোমরাই বলো!

ঘিরে আসে কারখানার মানুষ জন। বলাই আজ বলবে বলে নেমেছে, সে থামতে পারে না। চেঁচিয়ে বলে

—সুবলকে ডাকো! খাতা খুলে হিসেব করো! তুমি বলছো এ রিপেয়ারের খরচা তোমার গ্যারেজে ট্যাক্সি আসবার আগেই হয়েছে? এ যে দিনমানে পুকুর চুরি গো! এতকাল চুপ করেছিলে কেন তবে!

—বলাই, বড্ড বেড়ে যাচ্ছিস্ তুই, জানলি?

দশজনের সামনে জোচ্চোর প্রমাণ হয়েছে সুধীর। রাগে দুঃখে এমন দিশা হরিয়েছে, যে ভুল স্বীকার করবার কথা তার মনে পড়ে না। বলে

—খাতা দেখে নয় হিসেব ঠিক করবো, তা ব'লে তুই অপমান করবি আমাকে?

বলাইয়ের হাতে যতগুলো অস্ত্র ছিলো, এবার ছুঁড়ে ছুড়ে মারে। নিচু হয়ে লাল, গরম মুখে তীব্র সুরে বলে

—অনেক সইছি, আজ আমি বলবো! তুমি আমারে পাটনার করবে বলে ভাঁওতা দিয়ে বিলিতী কোম্পানীর চাকরী ছাড়িয়ে আননি?

—তো কি হয়েছে?

—তুমি অম্বিকাবাবুর অমন পাকা কাজটা আমারে ছেড়ে দিতে বলনি? বলনি, যে পাটনার করবে আমারে?

—বড্ড যে আশা তোর? হ্যাঁ বলাই, কি পুঁজি ছিল তোর?

মনের কথা নয়। রাগ, হিংসে, জ্বালা, এইসব অনমনীয় প্রবৃত্তির কথা। দুজনে পারলে দুজনকে ছিঁড়ে খায় যেন এখনি। বলাই বলে

—অমন জোচ্চোর্‌রি ব্যবসার ধার ধারেনা বলাই দাশ, জানলে সুধীরদা ? টাকা আমার নেইকো। কিন্তু তোমার মতো চশমখোর নই আমি। জানলে ? ঠিকানা দিচ্ছি, খোঁজ ক'রে এসো গে' হাওড়ায়। সেদিন পাঁচ হাজার টাকার গহনা আমি এমনি ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি।

—তুই বলতে চাস কি ? হ্যাঁ বলাই, তুই বলতে চাস কি ?

হাতেই-মারেনি। কিন্তু দুজনে দুজনের অবস্থা এমন করেছে কথার আঘাত দিয়ে দিয়ে, যে এখন দুজনেই ফুঁসছে আর গজরাচ্ছে ব্যথায়। সুধীর টেবিল ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাপ ডিস গেলাস সমেত একটেবিল কাগজপত্র মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সুধীর বলে

—তুই কি বলতে চাস ?

—বলতে চাই, যে ও রিপেয়ারের খরচা তোমার সুবল দেবে। কোনখানে কোন্ বজ্জাতি করে গাড়ী ভেঙেছিল, তারে শুধোওগে যাও ! সে খরচা আমার ঘাড়ে ফেলা চলবে না। শালা ভগ্নীপোত মিলে কল-কব্‌জা ঘুরিয়ে গাড়ীখানা বেহাত করে নিতে চাও, আমি জানিনা ? আর ও গাড়ী আমি নিয়ে যাব !

—আগে ধার শুধে যা !

—ধারশোধের সঙ্গে গাড়ী আটকাবার কি ?

—সই করে টাকা নিয়েছিস !

সেই কথা ? রাগে রক্ত শুকিয়ে মুখখানা শাদা হয়ে যায়। বলাই গালি দিয়ে কাগজ চাপাখানা ছুঁড়ে মারে সুধীরকে। সুধীরের কপাল কেটে ঝরঝরিয়ে রক্ত নামে। সুধীর বাঘ হয়ে ঝাঁপিয়ে আসে বলাইয়ের ওপর। সবাই হৈ হৈ ক'রে ধরে দুজনকে। বলাই চেঁচিয়ে বলে

—গাড়ী বেচে তোমার ধার শোধ দেব, নয় পথের ভিকিরি হয়ে যাব। তবু তোমার ধার আর ধারব নাকো সুধীরদা ! মুখ দেখব না তোমার।

—দোব না গাড়ী। এই গ্যারেজের চাবি আমার হাতে !

—পুলিশ ডেকে গাড়ী ছাড়াবো সুধীর দা !

—কয়গে থানাপুলিশ! একবার গেছে তো ভাল করে যাক ইজ্জৎ।

—তো আমিও বলছি জ্বালিয়ে দোব কারখানা! জ্বালিয়ে ছাই করে দেব।

সুধীর সকলের দিকে চেয়ে সমর্থন খোঁজে। অসহায় ও মরিয়া ক্রোধে বলে

—শুনলে তোমরা? হ্যাঁ? শুনলে? দরকার হলে সাক্ষী দিতে ডাকব সবারে! জানলে?

মিস্তিরি মেকানিকরা সুধীরের সমর্থনে একটা কথা-ও কয়না। বরঞ্চ বলাইকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে গঙ্গা সুধীরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে

—ভ্যালারে আমার পনেরো বছরের সম্পক্ক? খুব যে হেদিয়ে দোর ধরতে এয়েছিলি। কেমন ব্যাভারটা পেলি?

সবাই চলে গেলে পরে সুধীর ধন্দ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ছন্নছাড়া ঘরে। চড়াবাতি জ্বলে। টায়ার, পাম্প, তার, ব্যাটারী, হেডলাইট—এইসব অদ্ভুৎ চেহারার জিনিষ পত্তর, আর তার ওপরে আলো পড়েছে। আঠার মতো চটচটে রক্ত নামে। মুছে ফেলতেও হাত ওঠেনা। বুকটা জ্বলে যায় হা হা করে। কিসের জন্যে? কার জন্যে সংসার? যখন এমনি করে ছুরি মেরে খতম করে যায় বলাই? সেই বলাই! বেশ! সে-ও দেখে নেবে।

জমেছে যখন, ভাল করে-ই জমুক খেলা।

তিনদিন কারখানার ছুটি চলেছে। জুয়েল মোটর সার্ভিস দেউলে করে বুঝি বাজি পোড়াচ্ছে সুধীরবাবু। তল্লাটের রিপেয়ার শপ সব হাঁ হয়ে গিয়েছে। সুধীর বলে বেড়াচ্ছে

—রুবি কোম্পানীতে যাও বাবা, ভদ্দরলোকের খেলা দেখে এসো গে, জলসা, সিনেমা আর্টিষ্টের গান! আর মজুর মেকানিকের ফুর্ত্তি চাও তো এখেনে চলে এসো!

একগাদা বাজি জমা রেখেছে সুবল! রাত দশটা থেকে তুবড়ির কম্পিটিশান চলে।

বলাই ফন্দী আঁটছে সব ভয়ানক! কি দিয়ে কি করা যায়! গ্যারেজের চাবি সুধীরের কাছে। মাথায় শুধু রাগের কথা। খুনে চিন্তা। আর কোন চিন্তা নেই।

গঙ্গা, রাজু, মাণিক, জ্ঞান এসে জানিয়ে গেছে যে সুধীর বলে বেড়াচ্ছে

—বলাইকে এ তল্লাটে দেখলে পরে ঠ্যাং ভেঙে দিবি। পুরো টাকার ব্যবস্থা না করে যেন আসে না এদিকে!

বলাই অকথ্য গালি দিয়েছে শুনে। গঙ্গা বলে গিয়েছে,—রুবি কোম্পানীতে ঢুকে পড়বার সব ঠিকঠাক। সেখানে যাব তোরে নে' বলাই! দেখিস্, কেমন লুচি মাংস দুরকম মিষ্টি খাওয়াবেখ'ন।

বলাই কবুল হয়েছে। জুয়েল কোম্পানীর কাছাকাছি অন্য কোম্পানীতে ঢুকে বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দ করা? মেকানিকের ইজ্জতে যেন বাধে। কিন্তু তার আর ইজ্জত রাখলো কোথায় সুধীর?

জলসা যাদের, তাদের ব্যবস্থা ওপাসে। এপাসে বলাইদের মৌতাতটাও বেশ জমলো। অনেকরাত অবধি পরামর্শ হলো। এ কারখানার গোপেন মিস্তিরি বললো

—আমাদের মালিকের মক্কেল আছে তারিনীবাবু। ভাল উকীল। খুব বুদ্ধি! হয়কে নয় বানাতে পারে। তার কাছে নে' যাব অখণ তোমাকে। উকীলের কাছ হতে তেমন জোরদার একটা চিঠি পড়লে পরে বাপ বাপ করে গাড়ী ছেড়ে দেবে।

—যদি লোকজন নে' ভেঙে বের করে আনি?

—মাথা গরম ক'রো না ভাই। দুম করে ক্রিমিনালে পড়ে যাবে। জানলে? বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

—না, কাঁচাকাজ করবো না।

পরের ঝুট্‌ঝামেলা বেশীক্ষণ ভালো লাগেনা এদের। এবার রসালো কথাবার্ত্তা সুরু হয়। বলাই মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। তার কিছু ভাল লাগে না। ট্যাক্সি যে সুধীর আটকে রেখেছে সে জন্যে নয়। ট্যাক্সি আটকে রাখবার কোন অধিকারই নেই সুধীরের! সে ঠিক ছাড়িয়ে আনবে বলাই। কিন্তু সুধীরের টাকা? দুত্তোর, ধার করবে মহিন্দর সিঙের কাছে। বলবে

—তোমার বাপ আমার ধর্মবাপ ছিল ভাই, সেই বুঝে টাকা দাও।

সবটাই কেমন যেন খিঁচড়ে গেল। এমনিই বোধ হয় ঘটে। যেমনটি চাওয়া যায় তেমনটি ঘটে না।

সুধীরের কারখানায়ও ফূর্ত্তি হচ্ছে। তবে সুধীরের পুরণো মেকানিকদের দেখা যাচ্ছে না এই যা! সুবল সে কথা বলে জামাই-বাবুকে খোঁচাতে চায় নি। এ কথা থেকে সেই সব কথা যদি উঠে পড়ে? খাতায় গোঁজামিল দেবার কথা! বলাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটির পর-ই সুধীর সকল খাতাপত্তর নিয়ে গেছে বাড়ীতে। নির্ঘাৎ ধরেছে সুবলের দেওয়া গোঁজামিলটা! কিন্তু কেন যেন কিছু বলেনি। একটা কথা-ও নয়।

সুবল-ও ঠিক এমনটা করবার কথা আগে ভাবেনি। তবে তার দিদি যাবার পর থেকে জামাইবাবুর যেমন আচ্ছন্ন ভাব দেখা যাচ্ছিলো, তাতে করেই ভরসা হলো, যে না, মানুষটা হয় তো করবেনা কিছু। হঠাৎ ক্ষেপে উঠবে না। সে কেমন যেন একটা ধন্দ ধরা ভাব। বসে আছে তো বসেই আছে সার্টের কলার চিরকুটে ময়লা—ঘরেদোরে ঝুল পড়ে আঁধার হয়েছে। কোনদিকে খেয়াল নেই সুধীরের।

হঠাৎ যে সে মানুষটা সকল হিসেব পত্তর দেখতে চাইবে, ক্ষেপে উঠবে এমন করে, কে তা ভেবেছিলো!

অবাক হয়ে গিয়েছে সুবল। ভয়-ও পেয়েছে। কিন্তু সুধীর তাকে একটা কথাও বলেনি। বরঞ্চ বিশ্বকর্মা পুজো বাবদে প্রচুর খরচ করছে। পুরণো মেকানিকগুলো নেমকহারামী করে রুবি কোম্পানীর ব্যাক-ইয়ার্ডে বসে আছে তা কি সুধীর জানে না? জানে। তবে কোন কথা নেই মুখে। সামান্য নেশা করেছে। লাল চোখ টেনে টেনে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সব দেখে গেল সে। এখন বুঝি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে বড় বেঞ্চি দুইখানা জোড়া দিয়ে। সাড়া শব্দ নেই।

সুবলের বন্ধুবান্ধবরাই ফূর্ত্তি করছে বলতে গেলে। তারা নেশার সরঞ্জামও এনেছে। বেশ জমেছে। যে যারমতো ছুটছাট সরে পড়েছে। সুবল বারবার বন্ধুদের বলছে

—বাজি পোড়াবি, পোড়া! কিন্তু উ-দিকে নয় বাবা ফাঁকায় আয়। আগুন লেগে যাবে।

—বেশ!

কালীঘাট অঞ্চলের পাকা ছোকরারা তুবড়ির খোল-এ মশলা ভরেছে। জোরদার আগুন হচ্ছে। ভটাভট করে মাটির খোলগুলো ফাটছে। গ্যারেজের গা অবধি গেছে বাজির টুকরো টাকরা। সুবলের কাঁচা অভ্যাস। অন্যদের চেয়ে নেশাটাও তার হয়েছে বেশী। নেশার মুখে ঝিম আসছে ঘুমের।

এমন করে ঘুমোচ্ছিল সুবল যে সর্বনাশ ঘটলো তার অজান্তে-ই। রং পেট্রল, গাড়ী মোছা তেল, গ্রীজ—অভাব ছিলোনা কিছুর-ই। সাজানো ছিলো থরে থরে। হাউই গুলোর গতিবিধি রাত বারটার পর আর খুব হুঁসিয়ার ছিলোনা। তার থেকেই প্রথম আগুণটা লাগলো। ইয়ার্ডের মাটিতে পেট্রলের ছড়া ছড়ি। আগুণটা সাপের মতো আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। বাজির ঝুড়িতে তুবড়ি হাউই আর বোমার বোঝা। সেখানেই জমল ভালো।

সুরু হলো তাণ্ডব। তারপর সেখান থেকে আগুন ছড়ালো হু হু

করে। ভরা ভাদ্র মাস। তবু আকাশে মেঘ ছিলেনা। দিব্যি খট্‌খটে হয়ে ছিলো সব। আগুণের-ও সুবিধি হলো। তারপর হৈ হৈ, চীৎকার, মানুষের হল্লা, ফায়ারব্রিগেডে খবর চলে যায়—আর আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে আকাশপানে। পুলিশও আসে।

সর্বনাশের সে মাতামাতির খবর পৌঁছিয়ে যায় সর্বত্র। রুবি কোম্পানীতে-ও পৌঁছিয়ে যায় খবর। পুবদিকে আগুন লেগেছে। রাতের আকাশ লালেলাল। ফট্ ফট্ ফাটছে বাঁশ, কড়ি, বরগা! সকল দিক থেকে মানুষ ছুটে আসে। বলাই, গঙ্গা, রাজু সকলেই ছুটতে থাকে।

রোশনাই করে জ্বলছে জুয়েল মোটর ইয়ার্ড। গ্যারেজের দোর খোলা। গ্যারেজের মুখে আগুন জ্বলছে। ভেতরে যদি ঢো:কে আগুণ কনট্রাকট্ লরী আছে তিনখানা। গ্যারেজের চালা বেয়ে আগুন উঠেছে। পুজো প্যাণ্ডেলের বাঁশ, চট আর সামিয়ানা পেয়ে নেচে আসছে আগুণ। তাকিয়ে দেখছে সুধীর পুলিশের পাশে আর হাত মোচড়াচ্ছে।

আগুনের ভেতর দিয়ে টপকে টপকে কে চলে যাচ্ছে? পাগল হলো কি কেউ?

—বলাই? মরে যাবি!

চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে সুধীর। টিনের গেট না ভাঙলে বলাই বেরুবে কেমন করে। একটা বাঁশ কেন দেয় না কেউ সুধীরকে? সুধীর একখানা বাঁশ তুলে ধরে পাগলের মতো পেটাতে সুরু করে ছোট দরজা। গ্যারেজের ভেতরে আগুণের আঁচ আর শ্বাস-রোধকারী কালো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। থু থু করে থুথু ফেলে বলাই মুখ-চোখ থেকে ধোঁয়া আর ছাই তাড়ায়। ট্যাক্সির চাবি খোলে। আগুন কেমন জলের মতো আসছে দেখে। গ্যারেজের ওপরেই বুঝি ভেঙে পড়ে প্যাণ্ডেলের খানিকটা। আগুণ দেখা যায় সে ফাঁক দিয়ে। টিন ভেঙে পড়ে।

বলাইয়ের মাথাটা কিন্তু পরিস্কার কাজ করে। পেছনে তিনটে ট্রাক। এরা মূর্খ। নির্ঘাৎ ট্যাঙ্কে পেট্রল আছে। রিপেয়ারের গাড়ী, তাতে যদি আগুন লাগে ? ট্যাক্সির নম্বর সেভেন, ওয়ান, ও, ও, স্পষ্ট দেখা যায়। গর্জে ওঠে গাড়ী আর বেরিয়ে আসে বলাই। আগুন ধোঁয়া মাড়িয়ে —আগুন ধোঁয়ার মাঝখান দিয়ে। একেবারে মানুষগুলোর ভেতরে এসে পড়ে লাফিয়ে নেমে গা থেকে আগুন তাড়াতে চেষ্টা করে বলাই। হাত দিয়ে শার্ট থেকে ঝাপটায় আগুন। এবার তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে দেয় সুধীর মাটিতে আর গড়িয়ে চেপে ধরে। তাহ'লে এই আছে সুধীরদার মনে ?

—মরে গেলাম সুধীরদা !

বলে অজ্ঞান হয়ে যায় বলাই। আর গ্যারেজটার চাল ভেঙে পড়ে।

॥ তের ॥

অনেকদিন কলকাতার চিঠি পায়নি বিজলী। তবে সুধীরের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পেয়েছে! মনি-অর্ডারের কুপনে দুইলাইন শুভেচ্ছা-ও থেকেছে সুধীরের। 'যদি তোমার কোন অসুবিধা হয়, নিঃসঙ্কোচে জানাইও। সাধ্যমত সুবিধা বিধানে প্রস্তুত থাকিব। আমি ভালই আছি। তোমার কুশল-সংবাদ জানাইও।'

ভাল থাকবার কথাটা জোর করে কেন লেখে সুধীর? মনের দুঃখে হাসি পায় বিজলীর। মনে হয় যদি ভালই থাকে, সে ত' আনন্দের কথা। তবে ভাল থাকবার-ই বা এত কি কারণ ঘটেছে! এই দু'লাইন লেখবার মধ্যে-ও সুধীরের চরিত্র নতুন করে ধরা পড়েছে বিজলীর কাছে। সেই এক ঢঙের মানুষ। বিজলীকে টাকা পাঠিয়ে-ই খালাস। আর কোন দায় ঝামেলা নেই। আর, বিজলীকে ফিরে যেতে বলবার একটা অনুরোধ-ও নেই। বিজলী যাক বা না যাক, সুধীরের যেন কিছুই এসে যায় না।

সত্যিই কি এসে যায় না? এই নির্বেদটাই কি সত্যি? এই কথাটা ভাবতে গিয়ে-ই বিজলীর কাছে সব গোলমাল হয়ে যায়। সেই একটা দিনের কথা মনে পড়ে। দিন নয় রাত। সেই বলাইয়ের ছেলের অসুখ—তারা দু'জন ফিরলো।

আঁধার ছিলো বলেই কি নিজেকে অমন নগ্ন করে, অমন কাঙালের মতো মেলে ধরেছিলো সুধীর। না কি সেটাও ছিল তার অভিনয়? অভিনয় না, সত্যি। কত কথা বলেছিলো না সুধীর? বৌ আমি

তোমার ওপর দোষ করেছি, মাপ করো। বৌ আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। বৌ, আমি কোনদিনও জানিনি তোমার মনে এত দুঃখ। বৌ, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

মনের বেড়াটা ভেঙে এমন করে দেহে মনে কাছে এসেছিল সুধীর, যে বিজলীর মুখে জবাব হারিয়ে গিয়েছিলো। অঝোরে কেঁদেছিলো বিজলী। সে রাতে সুধীর কেমন করে বিজলীকে বেড়ে ধরেছিলো। যেন বিজলী ছাড়া তার কেউ নেই, কিছু নেই।

সেই সুধীর-ই বেইমানী করলো। এমন নিষ্ঠুর-ও মানুষ হয়? মানুষের সে নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে গিয়ে বিজলী কেমন যেন হয়ে যায়। যেন একটা ঘা-এর ওপরেই ছেঁচে ছেঁচে ব্যথা লাগছে। তাই কষ্টের অনুভূতিটা-ও ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। সেদিন-ই ভোর রাতে, যখন বিজলী পরমবিশ্বাসে তার হাতে মাথা রেখে শুয়ে আছে, পষ্ট শুনলো, যে সুধীর ঘুমের ঘোরে ডাকছে শান্তিলতার নাম ধরে—লতা, আমি তোমাকেই ভালবাসি। লতা, আমি তুমি ছাড়া আর কারুকেই জানি না।

ব্যস্। আর বুঝতে বাকি রইলো না বিজলীর, যে সে কিছুই নয়। ঐ শান্তিলতাকে মোটেই ভুলতে পারেনি সুধীর। প্রথমরাতে বিজলীকে ভালবাসার অভিনয় করেছে। আর শেষ রাতে সেই মরা বৌ-কে ঘুমঘোরে ডাকছে। এমন ব্যবহারের পর আর কি সেখানে থাকতে পারতো বিজলী? সম্ভব হতো কি? সম্ভব হ'লো না।

মনটা খারাপ করে এমনই বসেছিলো বিজলী! কাঁদবার-ও ইচ্ছে ছিলো খানিকটা। কিন্তু কাঁদলেই যে মন হাল্‌কা হবে তাও তো নয়। বাড়ীতে-ও কেউ নেই। মাসী গিয়েছে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে। বিদেশে এসে সংসার-ও হয়েছে সন্নেসীর গেরস্থালী। মেঝেতে বিছানা পেতে শোও। আর চালডাল যা হলো একচড়া ফুটিয়ে খাও। বেলা হয়ে গেল। হয়তো এসে পড়বে মাসী-রা। তাই উনোনটা ধরিয়ে দেকে

বলে উঠেছিলো বিজলী। হঠাৎ চোখে পড়লো চিঠি দু'খানা। এক-খানা পোষ্টকার্ড আর একখানা খাম। পোষ্টকার্ড খানায় তার বাপের হাতের লেখা। কার্ড হাতে নিয়ে চোখ আটকে গেল হরফে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। এ কি লিখেছে তার বাবা ?

—সুধীরের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আগুন লাগিয়া কারখানা জ্বলিয়া গিয়াছে। সুধীর নিজের কিছুই বাঁচাইতে পারে নাই। বহু টাকায় দেনদারী হইয়াছে। তাহার জখম তেমন গুরুতর নয়। তবে কপাল কাটিয়া ও পুড়িয়া গিয়া যে ঘা হইয়াছিল.........

সে চিঠি ফেলে দিয়ে খামখানা ছিঁড়ে ফেলে বিজলী। হেলান দিয়ে বসে পড়ে দেয়ালে। সুধীরের চিঠি।

—বৌ, তুমি ভুল বুঝিয়া চলিয়া গিয়াছ হইতে আমার মনে শান্তি নাই। বৌ, তুমি চলিয়া এস। আমি আর একলা পারি না। প্রত্যহ-ই মনে করি আজ তুমি আসিবে। কিন্তু তোমার দুর্জয় রাগ। আমি সকল দোষ ঘাড়ে লইতেছি। ক্ষমা চাহিয়া বলিতেছি তুমি এস।

বিজলী ঘেমে যায়। সহসা কেমন যেন অস্থির লাগে। মনে হয় শরীরটা যেন মনের আবেগ সহ্য করতে পারছে না। এখনি চলে যেতে পারলে হতো না ? কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে পা টলে যায়। সহসা মাথা ঘুরে পড়ে বিজলী। এমন কেন হলো ? আঁধার হয়ে আসে কেন সব ? বিজলী বুঝতে পারে না। অস্ফুটে বলে মা গো!

জ্ঞান যখন হয় বিজলীর মাসী তখন মাথা কোলে বসে রয়েছে। পাশের বাড়ীর গিন্নী আর তাঁর মেয়ে-ও এসেছেন। বলেন

—উঠো না মা! শুয়ে থাকো। মাসীকে বলেন

—এ আর ডাক্তারে কি দেখবে! আমি যা বলছি তাই। এখন আর এমন ধারা না ঘুরে ফিরিয়ে দিয়ে এসো যার জিনিষ তার হাতে। সবাই চলে গেলে পরে মাসীকে বিজলী আস্তে আস্তে বলে

—মাসী !

—পরে কথা ক'স্ । এই লেবু চিনির সরবৎ টুকু খেয়ে নে দেখি।

চুমুক দিয়ে খেয়ে বিজলী গেলাস রাখে। তারপর মাসী তার কাছে বসে অনেক কথা শুধোয়। অনেক কথা। বন্ধুজনের মতো। বিজলী বলে

—আমি ফিরে যাব মাসী।

—যাবি-ই তো। আমিই কি আর রাখব তোকে? আর জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ক'রো না বাবু। এ সময় তোমার বলে হাঁসপাতাল, ডাক্তার, কত দেখাশোনা দরকার! আমি কি করবো? তোমার বাবা তো মানুষ নয়। জামাই যা করবে তাই-ই হবে। বুঝলে?

মাসী নিজের কাজে গিয়েছে। বিজলী এখন কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। চোখের সামনে কি দেখছে যে মুখখানা লজ্জালজ্জা, একটু সুখের হাসি ঠোঁটে লাগা? চোখের সামনে তো একটা সাদা দেয়াল। তাতে সদ্য চুনকাম করা। এমন নয়, যে জল ছোপে কোন ছবি ফুটে উঠেছে। তবু বিজলীর চোখ দুটি যেন অনেক কাল পরে এক সুখকাননের ছবি দেখে বিভোর হয়েছে। আসলে সুখের ছবি বিজলীর মনে। চোখ দুটি যা দেখছে সবই অন্তরে। বাইরে কিছু নয়।

এবার চিঠিখানা পড়ে শেষ করে বিজলী—আজ আমার কারবার কারখানা কিছুই নাই। তুমি আসিলে গরীবের ঘরে আসিবে। এই সময়ই তোমাকে প্রয়োজন। আমার তো আর কেহ নাই। টাকা পাঠাইলাম। আমার যাইবার মতো শরীরের অবস্থা নয়। আঃ সুধীর।

বলাইয়ের সঙ্গে কথা অবধি কইতে মানা ছিলো দশ দিন অবধি। মুখের একটা দিকে পুড়ে গিয়ে ঘা হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কথা কইবার পরিশ্রমে ঠোঁটের সেদিকটা ছিঁড়ে যেতে পারে। বলাই কথা

কইতো না। চেয়ে চেয়ে থাকতো শুধু। একদিকের একটা চোখ নিরন্তর সুধীরকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছে। সুধীর বলাইয়ের হাত ধরে থেকেছে আর আশ্বাস দিয়েছে

—ভাবিস্ কেন? আমি তো আছি।

বলাই চেয়ে থেকেছে। সুধীর বলেছে

—বৌমা আর ছেলেদের আমি নিজে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিছি।

বলাই চেয়ে থেকেছে। সুধীর বলছে

—তোর ট্যাক্সি ঠিকই আছে। মোটে জখম হয়নি। গাড়ি গ্যারেজে তুলে দে এইছি।

যেদিন কথা কইতে পারলো বলাই। বৌ নয়, বেসু নয়, সুধীরকে বললো

—বৌদিদিরে আনিয়ে নাও। তোমারে কে দেখছে?

—আমি এখন বৌমার কাছেই খাচ্ছি রে। তবে লিখেছি তাকে।

কথা কয় না বলাই। চুপ করে থাকে। তারপর বলে আস্তে আস্তে

—কারখানার খবর কি সুধীরদা? একদিন-ও তো বলনা।

সুধীর অনেকদিন বাদে হাসে। বলে

—একেবারে সাফ।

—কি বললে?

—একবারে ধুয়েমুছে সাফ! তবে যে ভয় করিছিলাম, কণ্ট্রাক্টের গাড়ী ক-খানা একেবারে ভস্মসাৎ হয়নি। তা বলে বাঁচেনি কিছু।

—কি হলো?

বলাইয়ের উপর অনেকদিন বাদে চটে সুধীর। বলে

—ভোমা বুদ্ধি কেন রে তোর? বুঝিসনা কেন? ইন্সিওর তামাদি হইছিল, নতুন ইয়ার্ডখানা গিয়েছে। ও জমি বেচেকিনে কণ্ট্রাক্টের গাড়ীর ক্ষতি পূরণ দিতে হলো না?

বলাই বলে—তো তুমি কেন ট্যাক্সি নে বেরোওনা সুধীরদা?

—তুমি বলবে সেই অপেক্ষায় বসে রইছি কি না? আমিই তো বেরুচ্ছি চারদিন ধরে।

আস্তে আস্তে দুজনের চোখে চোখে মিললো। আস্তে আস্তে হাসতে সুরু করলো সুধীরের নিরানন্দ মুখখানা। আস্তে আস্তে বলাইয়ের একখানা চোখ আর একদিকের মুখও যেন সাড়া দিতে চাইলো। তারপর হাসতে গিয়ে বলাইয়ের একদিকে চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগলো। এত বড় ছেলে আবার কাঁদে না কি? তবে আজকে তো আর বলাই দুঃখ করে কাঁদছে না। ঘেন্না, রাগ আর হিংসে তার চোখ দুটোকে কতদিন জ্বালা দিয়ে রেখেছিল! আজ জ্বালা মরে গিয়ে জল আসছে শুকনো গাঙে।

সুধীর সে জল মোছায় ময়লা রুমালে। বলে

—বৌমা-রে ডাকি। কেমন বলাই?

॥ চৌদ্দ ॥

ট্যাক্সি গ্যারেজে তুলে দিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত সাড়েদশটা বাজলো। ঠোঙায় রুটি তরকারী কিনে বাড়ী ফিরলো সুধীর। ওপরের ঘরে বাতি জ্বলছে। পাখা ঘুরছে। সুবলবাবুর কোন ইয়ার বক্সী হবে নির্ঘাৎ।

বিজলী খাটের বিছানা পাতছিলো সকল কাজের শেষে। সুধীর তাকিয়ে রইলো দোরের কাছে দাঁড়িয়ে। বিজলী-ও চেয়ে রইলো। চোখে মুখে একটু লাজুক লাজুক হাসি। লজ্জা মাখানো। আবার একটু যেন স্মিত কৌতুকও আছে। কেমন গা ধোয়া ঠাণ্ডা সুন্দর চেহারা। মাস দেড়েক দেখাশুনা নেই বৌ তার সুন্দর হলো কি করে? রোগা হয়েছে। নরম কোমল একটা শ্রী চোখে মুখে। বিজলী এগিয়ে এসে ঠোঙাটা হাত থেকে নেয়। ঠোঙাটা রাখে টেবিলে। সুধীর কথা না পেয়ে বলে

—ঘরের বাতিটা যেন চড়া মনে হচ্ছে?—এর জবাবে বিজলী বলতে পারতো

—আমি এসেছি বলে।

তা বলে না। সে বলে

—সাফ করিছি। বড্ড যেন নোংরা হয়েছিলো।

সুধীর খাটে বসে। বিজলী গেঞ্জী আর লুঙ্গিটা পাশে রাখতে চায়। সুধীর হাত দু'খানা ধরে!

এইটুকু সাড়ার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল মেয়ে। এবার গলে নরম হয়ে ভেঙে পড়তে এতটুকু দেরী হয় না। সুধীরের মুখে কোন

কথা জোগায় না। তেলকালি মাখা নোংরা জামা-কাপড়, কদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, আর একটা কাঙাল তৃষ্ণার্ত মন। সুধীর মুখ ঘসে, অবুঝ প্রশ্ন করে অস্থির হয়ে ওঠে

—এতদিন আসোনি কেন? এত দেরী করেছ কেন?

বিজলী ফিস ফিস করে বলে—শরীর ভাল ছিল না যে!

—ইস্!

—সত্যি!

বিজলী ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্ফুটে বলে—আর এখন যখন তখন তাড়িয়ে দিতে পারবে না জানলে?

—কে তাড়াচ্ছে লতা?

—আমি আর কদিন? নতুনমানুষের কাছে জবাবদিহি হতে হবে না তোমাকে ক-দিন বাদে?

—কি বললে?

বিজলী চট্ করে মুখ লুকোয় সুধীরের কাঁধে। আস্তে করে বলে

—আমি অত বলতে পারি না। মাসী তোমারে চিঠি দিয়েছে। আমি টেবিলে রেখেছি। তুমি পড়ে দেখ।

এবার সুধীর ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে

—আর তুমি এই একা একা এত কাজ সেরেছো? এ্যাঁ? কখন এসেছ? সুবল ঘরে ছিল? খোকার মা-কে পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ। সে আর আমি কাজ সেরিছি। এসেছি সেই দুপুরে—তিনটের সময়। যা করে রেখেছিলে ঘরদোর!

সুধীরের সমস্ত শরীর ঢেলে এবার ক্লান্তি আর শান্তি নামে। ময়লা জামাকাপড় ছেড়ে বারান্দায় রেখে আসে। তারপর আদর কাড়ানো কোন ছোট ছেলের মতো দোষী দোষী স্নেহকাঙাল মুখ করে বলে

—ঘরে মানুষ না রইলে লক্ষ্মী থাকে?

—তো সেই লক্ষ্মীরে তুমি যখন তখন তাড়াও কেন? ডাকলেই যখন পাও?

—আর বলো না।

ঘরে দোরে সুশৃঙ্খলা। পরিষ্কার মেঝে, বিছানা, টেবিল, আলনা। বিজলী বলে—মিছেই পয়সা দে' রুটিতরকারী আনলে। ভাত রেঁধেছি। বাজার করে এনেছে খোকার মা।

—সুবল আসেনি?

বিজলী এবার সুধীরের চোখের দিকে চায়। বলে

—আমি কালীঘাটের বাসায় নেমেছিলাম। সুবলকে আর এখেনে থাকতে হবে না। জানলে? আমি মানা করে দিয়ে এসিছি।

—সে কি বিজলী?

—হ্যাঁ, তুমি আর একটা কথা-ও কয়ো না। বাবা নয়, সুবল নয়। আমি নিজের সংসার এবার নিজে করতে চাই।

তারপর বিজলী বলে

—হ্যাঁ গা, খুব না কি দেনদারী হয়েছ?

—কে বললে। সে তুমি ভেব না।

সুধীর এবার মনের বিশ্বাসে কথা কয়। বলে

—বুড়ো-ও হইনি, ক্ষমতা-ও হারাইনি কো! আধার ধারদেনা করে হোক, ঝা ক'রে হোক, রিপেয়ার শপ খুলবো একখানা। নয়, তো বাস একখানা চালাবো মফঃস্বলে যেয়ে। তুমি যদি ঘরখানা ধরে থাকো আমার আর ভয় কি বৌ?

বিজলী বলে

—ধার করতে তোমাকে দিচ্ছে কে? আমাকে না গয়নার রাশ ধরে দিয়েছ? আমি তা দে' কি করবো? যদি এইকালে কাজে না লাগলো? খোল তুমি দোকান।

তারপর বলে

—কাল আমারে তুমি নে' যেয়ো বলাইয়ের হাঁসপাতালে। কেমন ?

—নিশ্চয়।

লেনদেনের হিসেব করতে তখনো যে কতটা বাকি ছিলো বিজলীর, সে বোঝা যায় বলাইয়ের সঙ্গে যখন বিজলীর দেখা হয় তখন। বলাইয়ের খাটের পাশে টুলে বসে বিজলী। ব্যাণ্ডেজ খুলে এখন শুধু মলম লাগানো আধখানা মুখে। চেয়ে বিজলী অল্প অল্প হাসে। বলাই বলে—হাসছ কেন ?

—মুখ দেখে।

—দেখতে কেমন হয়েছে বলতো ?

—ভালই তো। ক-টা দিন শুধু নেই, এরই মধ্যে দাদা আর ভাই মিলে কি কাণ্ড বাধিয়েছিলে বল দেখি ?

—তা, হনুমান মুখ না পোড়ালে যে রামসীতার মিলন হতো না গো !

বিজলী-ও হাসে। বলে—রাম কোথায় ঠাকুর পো ? রাবণ বলো ?

—তা দাদা যদি রাবণ হয় তোমাকে-ও মন্দোদরী হতে হবে বাবু। অমন পাশ ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

—দু'জনে যা নির্বাসনে দিয়েছিলে ?

—সাধ্য কি গো তোমার রাজ্যপাট থেকে তোমারে নির্বাসনে দেই ?

বিজলী আর কথা কয় না। বলাই একটু চুপ করে থেকে বলে

—সত্যি বৌদিদি, মুর্খ মিস্ত্রিরী মানুষ, লেখাপড়া জানিনে কো। যা মনে হয় বলে ফেলি। তবে এ-ও বলি, যে আমরা দোষ ত্রুটি করলেই তুমি যদি ছেড়ে ছেড়ে যাও, তবে চলে কি ? হ্যাঁ ?

—কে যাচ্ছে ঠাকুর পো ?

সুধীর এবার বাজারের থলি হাতে ঢোকে। বলে

—হলো তোমাদের কথা? এই যে, যা যা বলেছো সব কিনে এনিছি।

বিজলী উঠে পড়ে। হেসে বলে

—সংসার ছয় নয় হয়ে রয়েছে। নিত্যি নিত্যি কিন্তু আসতে যেতে পারবো না। তা বলে যেন দুষী করো না।

বলাই-ও হাসে। বলে

—আর ফাঁকি দিলে শুনবো না। একবার যখন স্বীকার গিয়েছ ঠাকুর পো বলে, অমন ফেলে রাখলে শুনবো কেন?

ঘাড় কাৎ করে বিজলী বলে

—বেশ তাই হবে।

আজকে সুধীর আর বিজলীকে চলে যেতে দেখতে দেখতে বলাইয়ের মনে হয়, পোড়া ঘা-এর জ্বালাটা যেন তেমন করে লাগছে না।

তারপর-ও তিনটে মাস কেটে গিয়েছে। সুধীর এখন সেই জমির খানিকটা ভাড়া দিয়ে বাকিটায় খুলেছে একটা রিপেয়ার ওয়ার্কশপ। আর বলাই তার ট্যাক্সি চালায়।

W. B. T. 7100 ভবানীপুর অঞ্চলে চেনা ট্যাক্সি। বলাই ট্যাক্সিওয়ালার পাশে সুধীর মিস্তিরীকে দেখতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে সকলের। বলাইয়ের যে চোখটায় ভুরু নেই, সে চোখটার দোষ খুব কাছে বসে-ও ধরা মুস্কিল। তাকে গার্ড করে সুধীর মিস্তিরী সন্ধের পর। সময়ে চালায়-ও সে।

সারাদিনমান ছোট ওয়ার্কশপে কাজ করে সুধীর। গ্যারেজ বা কারখানা নেই বটে, তবু রিপেয়ার শপটা চমৎকার চলে। সুধীরকে আগে যারা দেখেছে, তারা এখন দেখলে চিনতে দেরী হবে মানুষটাকে। গ্যারাজ আর ইয়ার্ড পুড়ে ছারখার। যারা ভাড়া নিয়েছে তারা এখনও নতুন সেড তোলেনি।

সেই অগ্নিকাণ্ডের পর ভুমুল বর্ষা নেমেছিল। তাই পরিত্যক্ত ইয়ার্ডটা সবুজ ঘাসে ঢেকে গিয়েছে! এতখানি ক্ষতির ঝড়ঝাপটা যার ওপর দিয়ে গিয়েছে সেই সুধীর এখন শরীর সেরে চমৎকার বয়স কমের এক সুখী মানুষের মতো দেখতে হয়েছে। তার গলায় গান শোনা যায়। হাসি খুসী একটা চটপটে ভাব সুধীরের চলনে বলনে।

রুবি কোম্পানীর ওয়েল্ডিং মিস্তিরি গঙ্গা বলে সুধীরবাবুর না কি ঘরে মন বসে এমনটি হয়েছে। অনেক টাকা পাচ্ছে গঙ্গা। তবু তাকে এখন কাজ ছুটি হলেই সুধীরের দোকানে দেখা যায় ঘোরাফেরা করতে। বলাইকে দিয়ে গঙ্গা এমন কথা-ও বলিয়েছে, যে সে তো একলামানুষ—বৌ-ছেলে নেই, সুধীর যদি মনে করে, তো গঙ্গা এখনি ফিরে আসতে পারে এখানে। ঠিক যে টাকাপয়সার জন্যেই গিয়েছিল সে, তা নয়। এখন ফিরে আসতে তার খারাপ লাগবে না।

এখন-ও মাঝে মাঝে রুবি কোম্পানীর ক্লিনার ছোকরা জ্ঞান ঘর থেকে আসবার টাইমে সুধীরবাবুর খাবারটা পৌঁছে দিয়ে যায়। উপরি দশ টাকা মেলে, তো তাই সই। নতুন বিয়ে করেছে জ্ঞান, টাকার বড় দরকার হচ্ছে সম্প্রতি। সে যায় সুধীরের বাড়ী, আর এসে বৌ-কে শোনায় সুধীরের ঘরসংসারের কথা। বলে—অমনটি দেখবি না, জানলি?

সত্যি, সুধীরের ঘরসংসারে যেন লক্ষ্মীশ্রী ঝকমক করে। নিচের উঠোন খানায় এতটুকু জঞ্জাল শ্যাওলা নেই। সব ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। এতটকু জমিতে তুলসীমঞ্চ আর দোপাটি গাঁদার চারা। তুলসীমঞ্চে ঝারা বাঁধা। নিচের ঘরে চৌকি টুল পেতে বসবার বন্দোবস্ত। দোতলার ঘরগুলি যেন হাসছে। বিজলী ঝাড়ে মোছে আর তাই বলে চেয়ে চেয়ে। সুধীর তাকে ষ্টোভ কিনে দিয়েছে। উনুনের তাতে যেন না কষ্ট হয় বিজলীর!

এখন সুধার আর বিজলীর সংসারে অনেক সময় হাসি আর গান শোনা যায়। রেডিও, গ্রামোফোন বিজলীর গহনার সঙ্গে সঙ্গে, সুধীরের কারখানার ধার শোধ করতে চলে গিয়েছে বাড়ী ছেড়ে। বিজলী বলে

—জঞ্জাল গেছে, বেঁচেছি।

সুধীর বলে—বেশ হয়েছে। এখন অবসর করে বসো দিখিনি। আমি কেমন গান গাই শুনবে।

—কেমন গান ?

—মন্দ গাইতাম না গো ! এককালে শুনেছে বলাই।

—তো তাই বেশ !

W. B. T. 1700 ভবানীপুর অঞ্চলে টহল দিয়ে বেড়ায়। সন্ধে হলে বলাইয়ের পাশে সুধীরকে দেখা যায়। দু'জনে দু'জনকে পার্টনার বলে। বলাইয়ের ট্যাক্সিতে সুধীরের কোন শেয়ার নেই। সে কথা নয়। এ এমনই। ভালবাসার ডাক। স্টেট্‌বাসের কণ্ডাকটরদের কাছে শিখেছে তারা। মনের ভালবাসায় দুজনে দুজনের পার্টনার।